প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া

মাতৃদেবীর

চরণোদ্দেশে

ভূমিকা

নব্য-বিজ্ঞানের বয়স পঞ্চাশের মধ্যে রাখা হইল! যে বয়স পার হইলে আমাদের দেশে বনে যাইবার ব্যবস্থা আছে তাহার অধিক বয়স্ক কাহাকে আর যাহাই হউক অন্ততঃ নবীন বলা চলে না। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের নানান্ দিকে যে নানান্ বিকাশ ঘটিয়াছে তাহার কয়েকটী মাত্রের সামান্য একটু আভাস এখানে দিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র।

যে সকল পুস্তক হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে হার্ম্‌স্‌ওয়ার্থের পপুলার সায়েন্স্‌ তাহাদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থকার

অবতরণিকা

পঞ্চাশ মাইল দূরে সংবাদ পাঠাইতে হইলে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আলেক্‌জেণ্ডার দি গ্রেট্ (Alexander the Great) কে যে ব্যবস্থা করিতে হইত শত বর্ষ পূর্ব্বে নেপোলিয়ান (Napoleon) তদপেক্ষা সহজ ও দ্রুতগামী উপায় খুঁজিয়া পান নাই; রাণী এলিজাবেথ (Elizabeth) এর সভায় যে দীপের আলোকে সেক্ষপীয়ার (Shakespeare) ম্যাক্‌বেথ্ (Macbeth) পাঠ করিয়াছিলেন কবি কালিদাসের সময় বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় প্রদীপ তদপেক্ষা ম্লান ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই; বিজয়সিংহ লঙ্কাজয় করিতে যে জাহাজে চড়িয়াছিলেন, সেই জাতীয় জাহাজে করিয়াই ভাস্কো-ডি-গামা (Vasco-da-Gama) উত্তমাশা (Good Hope) ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসেন।

বিজ্ঞান বলিতে যদি বিশিষ্ট জ্ঞান বুঝায় তো এই ভূমণ্ডলে মানবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উৎপত্তি। দুইখানা কাঠ ঘষিয়া যে ব্যক্তি আগুন বাহির করিয়াছিল, নিউটন (Newton) বা গ্যালিলিও (Galileo) র অপেক্ষা তাহার কৃতিত্ব যে কম বলা যায় না। কিন্তু জন্ম হইতে বিজ্ঞান যে পা পা করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঘুচিতে উহার অনেক যুগ চলিয়া গেল। পরে দেখা গেল, সে হঠাৎ একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত কোন লোককে আজ যদি কোন রকমে এই পৃথিবীতে একবার আনা যায় তো সে বোধ হয় চিনিতে পারে না যে, এইখানে একদিন সে বাস করিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান-বলে, মানব আজ মাটী ছাড়িয়া বাতাসে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে, জলের মধ্যে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, একস্থানে দাঁড়াইয়া তারে এবং বিনা তারে সমস্ত পৃথিবীটাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতেছে তাহার আবাসস্থল হইতে রোগ জরা

মারী দূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সীসা ও সোনার মূলে যে একই অণু আছে আজ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; মানুষ, গাছ ও পাথর বিজ্ঞানে যে একই নিয়মের অধীন, জগদীশচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন; এমিল ফিসার (Emil Fischer) জীবদেহের উপাদান প্রোটিন (Protein) গঠনে লাগিয়া গিয়াছেন; এবং মেচ্‌নিকফ্‌ (Metchnikoff) এর মত যদি ভ্রান্ত না হয় তো অচিরেই পাঁইট বোতলে 'ফলেন পরিচীয়তে' লেবেল যুক্ত দীর্ঘায়ু হইবার ঔষধ বাজারে দেখা দিবে।

নব্য-বিজ্ঞান

১

কিছু কাল পূর্ব্বে আমেরিকাবাসী একটি বালকের ভারি ইচ্ছা হয়—সে একজন পাকা সিগ্‌নালার (Signaller) হয়। সামান্য মাহিনায় একটি টেলিগ্রাফ্‌ আপিসে সে চাকুরী লয়; দিনের বেলায় তাহার কাজ; কিন্তু কাজের ভিড় রাত্রিতেই খুব বেশী। কারণ, খবরের কাগজের যত টেলিগ্রাম, সেই সময়ই ঘন ঘন যাতায়াত করে। রাত্রে কাজ করিতে না পারিলে কাজে পাকা হইবে না, এই ভাবিয়া সেই বালক রাত্রের প্রধান কর্ম্মচারীকে অবৈতনিক ভাবে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করে। এই কর্ম্মচারী রাত্রে ঠিক আপন ধাতে

থাকিতেন না; সুতরাং বালকের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। বালক কাজে লাগিয়া গেল এবং তাহার সমবয়স্ক আর একটি বালককে সঙ্গে লইল। কিন্তু অপর দিক্ হইতে এত তাড়াতাড়ি শব্দ আসে যে, অল্পবয়স্ক এই বালকদ্বয় কিছুতেই তাহা ধরিতে পারে না। তখন তাহারা এক মতলব করিল। টরে-টক্কা শব্দ অনুযায়ী কাগজে ছোট বড় দাগ পড়ে, এইরূপ মর্স (Morse)-এর উদ্ভাবিত দুইটি পুরাণ যন্ত্র তাহারা লইল। একটি কাগজের লম্বা ফিতা দুইটাতে পরাইল। অপর দিকে যেমন টরে-টক্কা হইতে থাকিল, এ দিকে প্রথম যন্ত্রটিতে অমনি তদনুযায়ী কাগজের উপর গর্ত্ত গর্ত্ত হইয়া ছোট বড় দাগ পড়িতে লাগিল। এইবার দাগওয়ালা ঐ কাগজটা দ্বিতীয় কলের মধ্যে তাহারা চালাইয়া দিতে লাগিল, অমনি দাগের অনুযায়ী খুট্-খুট্ করিয়া টরে-টক্কা শব্দ হইতে থাকিল এবং সেই অনুসারে অপর দিক্ হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল;

সুবিধা এই হইল—দ্বিতীয় কলটি আস্তে আস্তে ঘুরাইয়া, যে শব্দ খুব তাড়াতাড়ি বলিয়া তাহারা আগে ধরিতে পারিতেছিল না, তাহা এখন ইচ্ছামত বাহির করিতে পারিল। কাজ এইরূপে তাহারা বেশ চালাইতে লাগিল। সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ খুব খুসী হইলেন; কিন্তু কি করিয়া কি হইতেছে, কিছুই বুঝিলেন না। কিছু দিন যায়; যুক্তরাজ্যে সভাপতি-নির্ব্বাচন। চারিদিক্ হইতে হুড়-হুড় করিয়া তার অসিতেছে; প্রথম যন্ত্রে দাগের পর দাগ পড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু দ্বিতীয় যন্ত্র আস্তে আস্তে ঘুরাইয়া সব কথা পাইতে তাহাদের দেরী পড়িয়া গেল; দুই ঘণ্টা তাহারা পিছাইয়া পড়িল। খবরের কাগজ-ওয়ালাদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল; কর্ত্তৃপক্ষের কানে উঠিল; তাঁহারা সবিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, ফলে ঐ বালকদ্বয় কি করিয়া এত দিন কি করিত, সব ধরা পড়িয়া গেল। ঐ যন্ত্র ব্যবহার বন্ধ হইল।

বালক কিন্তু ঐ যন্ত্রটা রাখিয়া দিল। কিছু দিন যায়, ঐ বালক তখন টেলিফোন লইয়া কাজ করিতেছে; হঠাৎ তাহার মনে হইল, টেলিগ্রাফের খুট্‌-খাট্‌ শব্দ যদি কাগজের উপর গর্ত্ত গর্ত্ত দাগে পরিণত করা যায় এবং সেই দাগ হইতে যদি আবার ঐ খুট্‌-খাট্‌ আওয়াজ বাহির করা যায়, তাহা হইলে মানুষের গলার স্বর এইরূপ করা যাইবে না কেন? তখন বালক এই ধরণের এক যন্ত্র তৈয়ারি করিতে লাগিয়া গেল। যন্ত্রটির মোটামুটি ব্যাপার এই;—একটা খুব পাৎলা চামড়ার গায়ে একটি সরু পিন লাগান এবং পিনটা একখণ্ড রাঙতার গায়ে ঠেকিয়া আছে। এখন আমরা যখন কথা কহি, বাতাসে ঢেউ উঠে এবং সেই ঢেউ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ চামড়ার সাম্‌নে যদি কথা কহা যায়, অমনি বাতাসে যে ঢেউ উঠে, সেগুলি চামড়ার গায়ে পড়িয়া চামড়াটাকে কাঁপাইয়া তোলে; এখন চামড়াটার সঙ্গে

পিন লাগান আছে, সুতরাং চামড়ার কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে পিনটাও নড়িতে থাকে, আর পিনটি রাঙতার উপরে আছে, সুতরাং রাঙতার গায়ে দাগ পড়িতে থাকে। কিন্তু দাগ তো রাঙতার এক জায়গায় পড়িবে; অতএব রাঙতাটাকে আস্তে আস্তে সরাইয়া লওয়া হয়, সুতরাং উহার উপর ধারাবাহিক একটি রেখা পড়িয়া যায়। এইরূপে কথাটা ধরা হইল। তাহার পর রাঙতার ঐ দাগের উপর পিনটা বসাইয়া রাঙতাটা আগেকার মত আস্তে আস্তে যেই সরাইয়া লওয়া হয়, অমনি পিনটা পূর্ব্বমত নড়িতে থাকিবে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাতলা চামড়াটাও কাঁপিতে থাকিবে। তাহা হইলে ঐ চামড়ার সাম্‌নের বাতাসটাও কাঁপিতে থাকিবে; কথা কহিবার সময় যেমন ভাবে কাঁপিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে। বাতাসের এই কাঁপুনি হইতে আমাদের শব্দের অনুভূতি হইবে; ঠিক আগেকার কথাটা আমরা ফিরাইয়া পাইব। প্রথম বারে চামড়াটা কানের কাজ

করিয়াছিল, এইবার মুখের কাজ করিতে লাগিল। এইরূপে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলের গানের প্রথম সৃষ্টি হইল। যে কারিকর ঐ কলটি তৈয়ারি করিয়াছিল, বালক যখন প্রথমে তাহাকে শুনাইল যে, কল কথা কহিতেছে, তখন ভয়ে তাহার মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

তাহার পর কতদিন ধরিয়া কত লোকের হাত দিয়া উহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। পাতলা চামড়ার বদলে প্রথমে কাচ এখন পাতলা অভ্র ব্যবহার হইতেছে। রাঙতার উপর লেখা তো তখনি চলিয়া গিয়াছিল, উহার পরিবর্ত্তে প্রথমে মোমের চোঙ্গা, তাহার পর আজকালকার মোম ও অন্যান্য জিনিস মিশাইয়া ঐ শক্ত চাকৃতি ব্যবহার হইতেছে। যাহাতে ঐ চাকৃতি একভাবে চলে, কখন জোরে কখন আস্তে না যায়, তাহারই না কত বন্দোবস্ত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক দিকে অনেক হাতে ইহার অনেক

উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আবিষ্কর্ত্তার কৃতিত্ব যদি কাহাকেও দিতে হয় তো উহা সেই সিগ্‌ন্যালার বালকের প্রাপ্য। সেই বালকই স্বনামধন্য এডিসন (Edison)।

২

রসায়নবিৎ যখন তাহার টেষ্ট-টিউব (Test-tube)এ পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছিল যে, 'মাড়' ও 'তুলা' একই উপাদানে গঠিত, কৃষক তখন হাসিতেছিল ও মনে মনে বলিতেছিল, 'বাপু হে, শুধু তাঙ্‌চো তো একবার গড়ো দেখি, তখন আমাদের দোরে আস্‌তে হবে।' চাষীর এই হাসি কিন্তু বন্ধ হইয়াছে এবং যেরূপ পত্তন আরম্ভ হইয়াছে, দুদিন পরে বা তাহাকে কাঁদিতে হয়।

এক সময় মনে করা হইত, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের নির্ম্মাণে বিজ্ঞানের কোন হাত নাই। তামার উপর এসিড (acid) দিয়া বিজ্ঞান তুঁতে তৈয়ারি করুক, কিন্তু চাল, ডাল, গম, চিনি, দুধ, মাখন এ সব

উৎপন্ন করিতে হইলে চাষ করিতে হইবে, গরু পুষিতে হইবে, রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে যাইলে চলিবে না। রাসায়নিকও প্রথম প্রথম এ কথা স্বীকার করিত এবং এ সব জিনিষ গড়িতে না পারুক, ঔৎসুক্য-বশতঃ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। যাহা পায় হাতের গোড়ায়, একদিক্ হইতে ভাঙ্গিতে লাগিয়া গেল। শেষ দেখিল, কয়লাতে যাহা আছে, সেই কার্‌বন্ (Carbon), যাহা যাহা মিশাইলে জল হয়, সেই হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও অক্সিজেন (Oxygen) এবং বাতাসে অধিক পরিমাণে যাহা মিলে, সেই নাইট্রোজেন (Nitrogen) এই কয়টা মৌলিক দ্রব্য আর গোটা কয়েক ধাতু—ইহাদের সংমিশ্রণে ঐ সকল দ্রব্য গঠিত।

ভাঙ্গা শেষ করিয়া সে ভাবিল, আচ্ছা, দেখা যাউক না কেন, গড়িতে পারা যায় কি না? এই বলিয়া আস্তে আস্তে গড়ার কাজ সুরু করিয়া দিল। ২০

বৎসরের অধ্যবসায় ও অজস্র অর্থব্যয়ের ফলে আজ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে বিজ্ঞান জয় লাভ করিয়াছে। ঠাকুরমার কাছে ছেলেবেলায় শুনা গিয়াছিল যে, কোম্পানী শীঘ্র একটা কল বাহির করিবে—যাহার একদিকে গরু ও খেজুরগাছ দিলে অপর দিক্ হইতে নূতন গুড়ের সন্দেশ বাহির হইবে। নূতন গুড়ের সন্দেশের আস্বাদ য়ুরোপ ও আমেরিকায় বোধ হয়, এখনও তেমন পৌঁছায় নাই; নচেৎ ঠাকুরমার বর্ণিত কল এত দিন বাজারে দেখা দিত। কিন্তু নব্য রসায়ন ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটাইতেছে। চারিটি গমের দানা দিয়া রসায়নবিৎকে এখন তাহার পরীক্ষাগারে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, সে ঐ গম হইতে তৈয়ারি করিবে সাবান, তেল, চিনি, রবার, রং, বার্ণিস, বারুদ আরও কত কি; এবং সব সময় যে মনসা ঢাকের দায়ে বিকায় না, একটি ঘটনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। ১৮৯৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৫ কোটী

টাকার নীল চালান হইত; বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজনীয় নীলের সাড়ে পনর আনা ভাগ জার্ম্মাণী (Germany) সরবরাহ করিত এবং তাহা চাষ করিয়া উৎপন্ন করিত না। জার্ম্মাণ রসায়নবিৎ রসায়নাগারে আলকাতরা হইতে তৈয়ারি করিত। খরচ এত কম পড়িত যে, আমাদের এই সস্তা মজুরের দেশের চাষীরাও প্রতিযোগিতায় হঠিয়া গেল। এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা আছে। রসায়নবিৎ যখন প্রথমে তাহার পরীক্ষাগারে শত শত টাকা খরচ করিয়া এক পয়সা দামের নীল প্রস্তুত করিল, তখন বিজ্ঞানের জয় হইল বটে; কিন্তু কৃষকের তখনও হার হইল না। সে যেমন চাষ করিতেছিল, তেমনি চাষ করিতে লাগিল। এখন এই কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিবার এক অবস্থায় ন্যাপথালিন (Napthalene) কে থ্যালিক এসিড (Thalic acid)এ পরিণত করিতে হয়। এটা গরম সল্‌ফিউরিক্

এসিড্ (Sulphuric acid) দিয়া করিতে হয়, কিন্তু ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। এটা তাড়াতাড়ি করিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করা হইল; কিন্তু কিছুতে কিছুই হইল না; একদিন যে থার্ম্মোমিটার (Thermometer) দিয়া ঐ মিশ্রিত দ্রব্যের তাপ লওয়া হইতেছিল, হঠাৎ সেটি ভাঙ্গিয়া তাহার পারাটা ঐ দ্রব্যের মধ্যে পড়িল এবং দেখা গেল, পূর্ব্বকার রাসায়নিক ক্রিয়া খুব দ্রুতভাবে চলিতেছে। এই এক আকস্মিক ঘটনা হইতে স্বল্পব্যয়ে নীল উৎপাদন করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। বলা যায় না, যদি থার্ম্মোমিটারটি না ভাঙ্গিত, তাহা হইলে আজও আধসের নীল প্রস্তুত করিতে জার্ম্মাণ রাসায়নিকের লক্ষ মুদ্রা ব্যয়কে ব্যঙ্গ করিয়া ভারতবর্ষের নীলকর দিন দিন ফাঁপিয়া উঠিত এবং ভারতবর্ষের বাতাস ধানের পরিবর্ত্তে নীলের উপর ঢেউ খেলিত।

শুধু উদ্ভিজ্জ পদার্থ তৈয়ারি করিয়া বিজ্ঞান ক্ষান্ত

নয় ; প্রাণীজ প্রোটিন (Protine) প্রস্তুত করিতে এমিল ফিসার (Emil Fishcer) যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জা জাতীয় পদার্থ-গঠনও বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত নয়। কিন্তু জীবদেহ সৃষ্টি করিতে পারিলেও যে জীবন সৃষ্টি করা হইল না, বিজ্ঞান এ কথা বুঝে, এবং ক্ষুদ্র কীটাণুকীটের জীবন-প্রবাহের বৈচিত্র্য দেখিয়া সে আজও বিস্ময়ে আপ্লুত হয় এবং এক বৃহৎ অজ্ঞাত শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বে অভিভূত হইয়া পড়ে।

৩

গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একদিন আমেরিকায় সান্‌ফ্রান-সিস্কো (San Fransisco) নগরে মহাধূমধামের সহিত যুক্তরাজ্যের সভাপতি মহামতি উইলসন্‌ (Wilson) একটি বোতাম টিপিলেন আর ২০০০ মাইল দূরে ভূগো-লের জলস্থলের বিভাগ উল্টাইয়া দিয়া, প্রকৃতির দুশ্ছেদ্য বন্ধন মোচন করিয়া, একটি মহাসমুদ্র আর একটি মহা-সমুদ্রের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিল।

কলোম্বস্‌ (Columbus) আমেরিকায় পৌছিয়া যখন বুঝিলেন, সেটা ভারতবর্ষ নয়, তখন পশ্চিম দিয়াই জল-পথে ভারতবর্ষে পৌছিবার একটা সহজ পথ তিনি খুঁজিতে লাগিলেন। সে পথ মিলিল না। দেখা গেল, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ কেপ হরণ (Cape Horn) বা উত্তর

আমেরিকার উত্তর গ্রীনল্যাণ্ড (Greenland) এর নিকট দিয়া ব্যতীত আটলাণ্টিক (Atlantic) হইতে প্রশান্ত মহাসাগর যাইবার জাহাজের কোন রাস্তা নাই। পানামার (Panama) নিকট স্থানটা খুবই অপ্রশস্ত; সেখানে এধার হইতে ওধার অবধি একটি খাল কাটিয়া সহজ পথ তৈয়ারি করা যাইতে পারে, এ কল্পনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অনেকের মনে উঠিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। সুয়েজ (Suez) খাল যখন শেষ হইল, তখন ঐ খাল-নির্ম্মাণ-কারক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার-(Engineer) দিগের উপর পানামাতে এক খাল প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কাজ আরম্ভ হইল, মাপ-জোক হইল, তাঁবু পড়িল, জিনিষপত্র আসিতে আরম্ভ হইল। খাল খুলিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখিলেন, কাজ কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়—এবং যে কোটী কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছিল,

তাহার সিকি আন্দাজ খরচ হইয়াছে, কতক নষ্ট হইয়াছে এবং বাকী কয়েক জন ভাগ্যবানের পকেটস্থ হইয়াছে। জিনিষপত্র যাহা কিছু কিছু ছিল, তাহার মধ্যে দেখা গেল, বড় বড় পিয়ানো কতকগুলি এবং রাশীকৃত হেয়ারপিন (Hairpin)। পরিচালকদিগের অসাবধানতায় বা অসাধুতায় জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী (Jointstock company) ফেল হওয়া শুধু এ দেশেরই একচেটিয়া, এ কথা যাঁহারা মনে করেন, এ ঘটনাটি তাঁহারা যেন স্মরণে রাখেন। ইহার পর আর একটি ছোট কোম্পানী কিছু কম টাকা লইয়া লাগিয়া গেল। এবারে তাহারা পানামা ছাড়িয়া নিকারাগুয়া (Nicaragua) তে কাজ আরম্ভ করিল। কিন্তু এ কোম্পানীর পুঁজি অল্প, শীঘ্র দেউলিয়া হইল। ব্যক্তিবিশেষ বা কোম্পানীবিশেষ যাহা পারিয়া উঠিল না, একটি জাতি এইবার তাহাতে হাত দিল। স্পেন (Spain)-এর সহিত যুদ্ধের পর যুক্তরাজ্য (United states) দেখিল

যে, যেরূপেই হউক, তাহার এদিক্ হইতে ওদিক্ ইচ্ছা-মত জাহাজ পরিচালনা করিবার একটি সহজ পথ করিতেই হইবে। এ কার্য্যের ভার যুক্তরাজ্য গ্রহণ করিল। পানামা কিন্তু তখন কলম্বিয়া (Columbia) গভর্ণমেণ্টের অধীন। কলম্বিয়া গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই যুক্তরাজ্যের সহিত কোন সর্ত্তে রাজী নয়। এইরূপ অবস্থা; হঠাৎ পানামাবাসী কলম্বিয়ার আধিপত্য ছিন্ন করিয়া রাষ্ট্রীয় তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিল এবং অবিলম্বে যুক্তরাজ্যের সহিত যুক্তি করিয়া খালের পথ এবং উভয় দিকে ৫ মাইল করিয়া জমি যুক্তরাজ্যকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিল। ১৯০৪ সালে যুক্তরাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারগণ কাজে হাত দিলেন। কিন্তু কাজ হইবে কি; যে যায়, আগে বিছানা লয়। ম্যালেরিয়া, ইওলো ফিভার (Yellow fever), টাইফয়েড (Typhoid) প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব এত বেশী যে, পানামার মত অস্বাস্থ্য-কর স্থান তখন আর পৃথিবীতে ছিল কি না সন্দেহ।

এক বৎসর পরে সেনেট (Senate) অবগত হইল যে, যদিও সতর হাজার লোক কাজে গিয়াছে, এক কোদালও মাটী উঠে নাই। সেনেট স্থির করিল, আগে ঐ স্থানকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে হইবে, পরে অন্য কথা। ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ বন্ধ হইল, ডাক্তারেরা লাগিয়া গেল। বন-জঙ্গল পরিষ্কার হইল, জল-নিকাশের ব্যবস্থা হইল, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত হইল, মশা মারা হইল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ী-ঘর তৈয়ারি হইল, কিছু দিনের মধ্যে স্থানটিকে এইরূপ স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় করিয়া তোলা হইল যে, যে পানামার নামে লোকে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সেখানে এখন লোকে দলে দলে সখ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে গেল। এইবার ইঞ্জিনিয়াররা কাজে হাত দিল। মানুষের বুদ্ধিতে ও টাকায় যাহা সম্ভব, তাহা হইল। ৩৯ মাইল পাহাড় কাটিয়া, একটি নদীর মুখ বন্ধ করিয়া, তাহাকে হ্রদে পরিণত করিয়া, ৪৬ মাইল লম্বা ৩০০ হইতে ৫০০

ফিট্ চওড়া ও ৪১ ফিট গভীর একটি খাল কাটা হইল।

এই পানামা খাল দ্বারা আমেরিকার নানা দিকে স্থবিধা হইয়া গেল। তাহার রণতরীর ক্ষমতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় পথের স্বল্পতা বড় কম লাভ নয়। নিউইয়র্ক (New york) হইতে জাপান, সিডনি (Sydney) যাইবার পণ্যবাহী জাহাজ আর পূর্ব্বমুখে যাইবে না এবং তদ্দ্বারা তিন চার হাজার মাইল পথ কমিয়া যাইবে। স্থয়েজ খাল দ্বারা ইয়োরোপ যতদূর লাভবান্ হইয়াছিল, পানামা খাল দ্বারা আমেরিকার লাভ তদপেক্ষা অধিক হইল।

পৃথিবীতে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল। পূর্ব্বের অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল; সফলতা আসিল তখন—যখন ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering) শাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত মিলিত হইল এবং উভয়ের সহিত একত্র হইল একটি সমগ্র জাতির সমবেত চেষ্টা

ও অজস্র অর্থব্যয়। ডাক্তারেরা বলে, বাহাদুরি আমাদের; ইঞ্জিনিয়াররা বলে, কৃতিত্ব শুধু আমাদেরই; বিজ্ঞান বলে, যে দিক্ দিয়া ধর, জয় আমারই।

৪

নোবেল (Nobel) নামের সহিত এ দেশ বিশেষভাবে পরিচিত—কবিবর রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাইবার পর হইতে। একটি পাৎলা ছিপছিপে লোক মানুষ মারিবার চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া এত উপার্জ্জন করিল যে, সেই উপার্জ্জিত অর্থ হইতে দেশহিতকর কার্য্যে প্রদত্ত অংশের সুদে প্রতি বৎসর তাঁহার নামে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করিয়া পাঁচটি প্রাইজ দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু যে পদার্থ একদিকে সুন্দর ও সুচারুরূপে মানুষ মারিতেছে, তাহাই আবার অন্যদিকে মানবের দাসত্ব করিয়া প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। যে সকল আবিষ্কার এই পৃথিবীর চেহারাটা

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বদলাইয়া দিয়াছে, নোবেল আবিষ্কৃত বিস্ফোরক (Explosive) তাহার অন্যতম। ইন্দ্রপ্রস্থে, রোমে সুন্দর পথঘাট শত শত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমতল ভূমি ছাড়িয়া পার্ব্বত্য-প্রদেশে সৈন্যচালনার প্রশস্ত পথ তৈয়ারি করিতে হানিবল (Hannibal)ও পারেন নাই, শিবাজীও পারেন নাই। শক্ত মাটী আঁচড়ান তখন মানবেরও দুঃসাধ্য ছিল, খাল-বিল কাটা হইত শুধু নরম জমিতে এবং সে কার্য্যও এরূপ গজেন্দ্রগমনে চলিত যে, একসময় তিন মাইল লম্বা একটি খাল কাটা হইয়াছিল ত্রিশ হাজার মজুর এগার বৎসর কাজ করিবার পর। তখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত খনিজ পদার্থ ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে বাহির করা হইত। কিন্তু এই বিস্ফোরক বাহির হইবার পর মানব আর কোন বাধাকে বাধা বলিয়া মানিতেছে না; দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতকে সমতল ভূমিতে পরিণত করিতেছে, নাড়া-চাড়া দিয়া পৃথিবীর ভিতরটা টানিয়া

বাহির করিতেছে এবং ইহারই সাহায্যে যেটা এত দিন ছিল—যোজক, সেটাকে পরিণত করিল—প্রণালীতে।

এই বিস্ফোরকের ক্রিয়ায় যে রাসায়নিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা মোটামুটি এই;—এক খণ্ড লৌহ বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে সাধারণতঃ এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাতে মরিচা ধরে; উনানের কয়লা ধরাইয়া রাখিলে এক ঘণ্টার মধ্যে উহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রে বাতাসের অক্সিজেন (Oxygen) ঐ সকল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ পরিবর্ত্তন ঘটায়। লোহার সহিত মিশিতে যাহার সপ্তাহ লাগিল, কয়লার সহিত সেই অক্সিজেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিশিয়া গেল। ডিনা-মাইট (Dynamite)ও ফাটে অক্সিজেনের সহিত মিশ্রণের ফলে, কিন্তু এখানে ঐ মিশ্রণ-কার্য্য শেষ হয় সপ্তাহে ঘণ্টায় মিনিটে নয়, একটি সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশে। এক ফুট লম্বা এক ডিনামাইট ফাটে এক

সেকেণ্ডের চব্বিশ হাজার ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে এবং নাইট্রোগ্লিসিরিন (Nitroglycerine) ফাটে ইহা অপেক্ষা কম সময়ে। এখন কয়লা বাতাসে না পোড়াইয়া যদি এমন কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পোড়ান যায়—যাহাতে অক্সিজেনের ভাগ বাতাস অপেক্ষা অধিক, যেমন সোরা, তাহা হইলে ঐ দহন-ক্রিয়া অতি সত্বরই সম্পাদিত হইবে।

এই বিশ্বে পদার্থের হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, শুধু রূপান্তর আছে মাত্র। মোমবাতি যখন জ্বলিয়া শেষ হইয়া গেল, তখন যাহা কঠিন অবস্থায় এতটুকু স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখন তাহা অদৃশ্য গ্যাস (Gas) এ পরিণত হইয়া বিপুল আকার ধারণ করিল। নাইট্রো-গ্লিসিরিনের ন্যায় প্রচুর অক্সিজেন-যুক্ত কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া কোন পদার্থকে যদি নিমেষের মধ্যে গ্যাসএ পরিণত করা যায় তো আকারের হঠাৎ পরিবর্ত্তন-জনিত এক মহাবল উৎপন্ন হয়। অল্পপরিমাণ অক্সিজেন

পাইয়া তেলের আলো জ্বলিতে থাকে, প্রচুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া এই তেলের হঠাৎ অবস্থান্তরজনিত যে ভীমবল উদ্ভূত হয়, তাহা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে মটর-গাড়ী চালান হয়; এবং এই জাতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে একটা গোটা সহরকে উপড়াইয়া চুরমার করিয়া ফেলা হয়, পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেলওয়ের লাইন পাতা হয়, ভিতরের মাটী উপরে তুলিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়ান হয়, আবার যুদ্ধক্ষেত্রে এক নিমেষে এক সঙ্গে হাজার লোকের জীবনলীলা শেষ করা হয়।

৫

কালস্রোত যখন উনবিংশ শতাব্দীকে ধাক্কা দিয়া বিংশ শতাব্দীর সম্মুখীন হইল, বৈজ্ঞানিক সেই সময় একটা কাচের গোলক হইতে বাতাস বাহির করিয়া, তন্মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিয়া যাহা দেখিলেন এবং তাহা হইতে যে নূতন তথ্যে উপনীত হইলেন, তাহা জনসাধারণকে তো বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিলই, তাহার নিজেরও বহুদিনের পোষিত মতকে একেবারে নাড়াচাড়া দিয়া বিশ্বের অনৈক্যের মধ্যে এক বিরাট্‌ সাম্য দেখাইয়া দিল। ঐ কাচের গোলক হইতে রন্‌জেন্‌ (Rontgen) এক আলো বাহির করিলেন—যাহা কাগজ, কাচ, মানুষের রক্তমাংস ভেদ করিয়া অবাধে চলিয়া মানবকে এক নূতন দৃষ্টিশক্তি দান করিল। এ দিকে জে,

জে, টম্‌সন্ (J. J. Thomson)-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুশূন্য গোলকমধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ লইয়া পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই বিশ্বে প্রত্যেক পদার্থ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলিলে শেষে যাহাতে গিয়া পৌছান যায়, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই, কোন বৈষম্য নাই। ব্যাপারটা আরম্ভ হইয়াছিল ব্যক্তি-বিশেষের খেয়াল হইতে, শেষ হইল এক মহান্ সত্যের প্রতিষ্ঠায়।

বাতাস তড়িৎপ্রবাহের গতিকে বাধা দেয় দেখিয়া ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে প্লুকার (Plucker) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক একটি কাচের গোলক হইতে যথাসম্ভব বাতাস বাহির করিয়া, তন্মধ্যে বিদ্যুৎ চালিত করিয়া দেখিলেন যে, যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ ঐ কাচের গোলক হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, যাহাকে ক্যাথোড (Cathode) বলে—তথায় এক প্রকার আলোক-রশ্মি উদ্ভূত হইয়া ঐ বায়ুশূন্য কাচের গোলকের গায়ে গিয়া পড়িতেছে এবং

সেই স্থানটা সুন্দর রঙ্গিন আলোকে রঞ্জিত হইতেছে। এই আলো যে সাধারণ আলো, ইহাও যে ঈথরের তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছু নয়: বহুদিন যাবৎ এ কথা মনে করা হইত ; সুতরাং অনেক দিন পরে ক্রুক্স্ (Crookes) যখন বলিলেন যে, এ আলোক পদার্থের সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম কণার সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়, লোকে অবাক্ হইয়া গেল এবং কথাটা ঠিক ভাবে লইল না। ক্রুক্স্ দেখাইলেন যে, একটা ঘূর্ণীর উপর এই আলো পড়িলে উহা ঘুরিতে থাকে ঠিক সেই দিকে একটা বড় ঘূর্ণীর উপর বন্দুকের ছর্‌রা পড়িলে উহা যে দিকে ঘুরে। ক্রুক্স্এর সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য জার্ম্মাণীর তিন জন বড় বৈজ্ঞানিক হার্জ (Hertz), লেনার্ড (Lenard) ও রন্‌জেন্ (Rontgen) লাগিয়া গেলেন। কাচ-গোলক হইতে অতিমাত্রায় বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া তন্মধ্যে একটি প্রবল বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিতে করিতে রন্‌জেন্ এক অভাবনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। ঈথরের সকল

তরঙ্গ আমাদের দৃষ্টির গোচর হয় না। ঈথর যদি সেকেণ্ডে ৮ কোটী কোটী বারের উপর কাঁপিতে থাকে তো আমাদের চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না; কিন্তু কতকগুলি দ্রব্য আছে—যেমন বেরিয়ম্ প্ল্যাটিনোসায়ানাইড (Barium Platinocyanide) যাহা এইরূপ অদৃশ্য আলোককে দৃশ্য আলোকে পরিণত করিতে পারে। রন্‌জেন্ একদিন এই ক্যাথোড্-রশ্মি লইয়া কাজ করিতেছিলেন, নিকটে একখানা বেরিয়ম্ প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের পর্দ্দা ছিল; তিনি হঠাৎ দেখিলেন, সেই পর্দ্দাখানা আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইবার তিনি ঐ কাচের গোলকটি কালো কাগজ দিয়া বেশ করিয়া মুড়িয়া ফেলিলেন—যাহাতে একটুও ক্যাথোড্-রশ্মি বাহিরে না নির্গত হয়। তবুও দেখা গেল, ঐ ভয়ঙ্কর অন্ধকার ঘরের মধ্যেও ঐ পর্দ্দাটি জ্বলিতেছে। তখন তিনি ঐ কাচের গোলক আর ঐ পর্দ্দার মধ্যে নানা জিনিষ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন, পর্দ্দাটি

উজ্জ্বল হয় কি না? কাগজ ধরিলেন—ঐ পর্দ্দা পূর্ব্ববৎ আলোকিত হইতে লাগিল; কাঠ ধরিলেন;—তাহাও ভেদ করিয়া ঐ অদৃশ্য আলো আসিতে লাগিল। তখন তিনি নিজের হাত উহার মধ্যে ধরিয়া এক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিলেন যে, যেখানে হাড়, সেখান দিয়া মোটেই আলো আসিতেছে না; কিন্তু মাংস ভেদ করিয়া ঐ আলো বেশ চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং ঐ পর্দ্দার উপর হাতের মধ্যের হাড় জিরজির্ করিতেছে বেশ স্পষ্ট দেখা যাই-তেছে। এইরূপে জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষা-গারের অন্ধকার ঘরে মানব এক প্রকার আলো আবিষ্কৃত করিল—যাহা ভগবান্ বিবস্বানের আলোককে পরাভূত করিয়া, তথাকথিত স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছের ব্যবধান চূর্ণ করিয়া, তাহাকে এক নূতন দৃষ্টিশক্তি দান করিল। এই আলো এখন চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটি অপরিহার্য্য অংশ। হাত ঠিক কোন্ জায়গায় ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুকের গুলী কোন্ জায়গায় গিয়া আটকাইয়া আছে, শিশু সিকি দুয়ানি

গিলিয়া ফেলিয়াছে, সিকি দুয়ানি পেটের কোন্ স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এই আলোকের সাহায্যে চিকিৎসক ধরিয়া ফেলিতেছেন। ক্যাথোড্-রশ্মি চলিতে চলিতে হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইলে এই অদৃশ্য আলোক উদ্ভূত হয়। বিজ্ঞানে কোন অজ্ঞাত পদার্থকে x বলা হয়। রন্‌জেন্ এই নূতন আলোকের নাম দিয়াছিলেন x রে (ray)। সাধারণতঃ ইহা অদৃশ্য, শুধু বেরিয়ম প্লাটিনো-সায়ানাইডের মত কোন পদার্থের উপর যখন পড়ে, তখনই ইহা দৃশ্য আলোকে পরিণত হয়।

এক টুকরা সোনাকে ক্রমাগত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলিলে শেষে উহা এমন অবস্থায় গিয়া পৌঁছায়, যখন আর উহাকে ভাঙ্গা চলে না। এই অবস্থার পদার্থকে বৈজ্ঞানিক এটম্ (atom) বলে। একটি সীসার এটম্ একটি সোনার এটম্ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ওজন, রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্; রসায়ন শাস্ত্রের ইহাই মূল কথা ছিল। গত ১৮৯৭ সালে অধ্যাপক জে, জে, টম্‌সন্ অত্যন্ত বেশী পরি-

মাণে বায়ুশূন্য একটি কাচের গোলকের মধ্যে প্রচণ্ড তড়িৎ-প্রবাহ লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে, এটম্ পদার্থের শেষ পরিণাম নয়, ইহাও একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, এবং টুকরা টুকরা হইয়া এই এটম্ যাহাতে গিয়া দাঁড়ায়, এই ইলেক্ট্রন (electron) ইহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই, তা যে জিনিষের এটম্ ভাঙ্গিয়া ইহা পাওয়া যাউক না কেন। সোনার এটম্ সীসার এটম্ হইতে ভিন্ন, কিন্তু সোনার এটম্ ভাঙ্গিয়া যে ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়, আর সীসার এটম্ ভাঙ্গিয়া যে ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়, সকল বিষয়ে তাহারা এক, মিশাইয়া দিলে চেনাই যায় না যে, এটা সোনা হইতে আর ওটা সীসা হইতে পাওয়া গিয়াছে। ঈথরের তরঙ্গ-সমষ্টি সাধারণ আলোক চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইলেক্-ট্রন-সমষ্টি এই ক্যাথোড্-রশ্মি চুম্বক দ্বারা বাঁকিয়া যায়। সুতরাং এই ক্যাথোড্-রশ্মি সাধারণ আলোক নয়। বিশিষ্ট গুণযুক্ত পদার্থকে যখন চুম্বক টানে, তখন ঐ

ইলেকট্রন পদার্থের এই সূক্ষ্ম অবস্থা, এবং দেখা গিয়াছে, ইহা তড়িৎমণ্ডিত বলিয়াই চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যে চুম্বকের এবং যে তড়িতের বল জানা আছে, সেই চুম্বক ও তড়িতের বলে ইলেকট্রন-সমষ্টি ক্যাথোড্-রশ্মির পথ কিরূপভাবে এবং কতটা বাঁকে, জে, জে, টম্সন্ পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিলেন এবং তাহা হইতে এক একটি ইলেকট্রনের ওজন দ্রুততা প্রভৃতি বাহির করিলেন। সংখ্যার দ্বারা এই সকল কল্পনায় আনা সুকঠিন, অন্য উপায়ে ধারণায় আনা চেষ্টা করা যাউক। এই পৃথিবীর কাছে একটি ক্রিকেট্ বল যেরূপ, এক ফোঁটা জলের কাছে একটি এটম্ সেইরূপ, এবং এমন এটম্ও আছে, যাহাতে লক্ষাধিক ইলেকট্রন বিচরণ করিতেছে। এই যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ যাহাকে ধারণায় আনিতে মানুষ তাহার চিন্তা-রাজ্যের পরিধিকে বিস্তৃত করিতেছে—তাহার কত না ঘরের খবর বিজ্ঞান আজ টানিয়া বাহির করিতেছে।

কোথায় আরম্ভ হইয়াছিল, আর আজ কোথায় পৌঁছিয়াছে, শেষই বা কোথায় কে জানে ?

কিন্তু সবার মূলে যদি একই ইলেক্‌ট্রন থাকে তো পদার্থের বিভিন্নতা কোথা হইতে আসিল ? এবং যদি বা আসিল তো এক পদার্থকে আর এক পদার্থে পরিবর্তিত করা যাইবে না কেন ?

সংযোগ-তড়িৎযুক্ত একটি বড় ইলেক্‌ট্রনকে ঘিরিয়া বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত কতকগুলি ছোট ইলেক্‌ট্রন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহ উপগ্রহ লইয়া যেমন সৌরজগৎ, এই সকল চলন্ত ইলেক্‌ট্রন লইয়া এক একটি এটম্। সোনার এটম্ সীসার এটম্ হইতে ভিন্ন ; কারণ, উভয়ের মধ্যে ইলেক্‌ট্রন্‌দের ঘুরিবার ধারা পৃথক্। সোনার এটমে ইলেক্‌ট্রনরা এক রকমে ঘুরে, সীসার এটমে তাহারা সংখ্যায় ভিন্ন ও ভিন্ন রকমে ঘুরে, তফাৎ শুধু এই মাত্র। সোনাকে সীসা করা যায় না ; কারণ, ইলেক্‌ট্রনদের এই ঘুরিবার ধারা মানব আজও বদলাইতে

পারিতেছে না। যে দিন তাহা পারিবে এবং অল্প আয়াসেই পারিবে, সে দিন আর যাহাই হৌক, খপ্ করিয়া সোনার বাজুবন্দ দিয়া গৃহিণীর মানভঞ্জন করা আর চলিবে না।

কিন্তু মানব যাহা পারিতেছে না, প্রকৃতির রাজ্যে স্বতঃই তাহা সম্পাদিত হইতেছে। রেডিয়ম (Radium) বলিয়া একটি ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে—যাহার জন্ম অন্য ধাতু হইতে এবং পরিণতি অন্য ধাতুতে।

একস্ রে (Xray) আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগতে যখন মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল, তখন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কাঠ, কাগজ প্রভৃতি অস্বচ্ছ দ্রব্য ভেদ করিয়া যায়, এইরূপ আলো ক্যাথোড্-রশ্মির হঠাৎ গতিরোধ ব্যতীত অন্য উপায়ে উৎপন্ন করা যাইতে পারে কি না, দেখিতে লাগিয়া গেলেন। কতকগুলি পদার্থকে সূর্য্যের আলোকে কিছু সময় রাখিয়া অন্ধকার ঘরে লইয়া যাইলে তাহারা জ্বলিতে থাকে, ইহাদিগকে বৈজ্ঞানিকেরা ফস্ফরাসেণ্ট (Phos-

phorescent) পদার্থ বলে। জোনাকি, চিংড়ি, কেঁচো, থিয়াটারের মহাদেবের মাথায় যাহা জ্বলিতে থাকে, সেই বেরিয়ম সল্‌ফাইড (Barium Sulphide) প্রভৃতি পদার্থ এইরূপ। ফ্রান্সের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বেকারেল্ (Becquerel) এই সকল ফস্‌ফরাসেণ্ট পদার্থ হইতে এক্‌স্-রের ন্যায় অদৃশ্য আলোক বহির্গত হয় কি না, পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফোটাগ্রাফির কাচের উপর সাধারণ আলো পড়িলে যে পরিবর্ত্তন হয়, অন্ধকার ঘরে কাল কাগজে মোড়া ঐ কাচের নিকট এক্‌স্-রে আনিলে সেই পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। এক্‌স্-রে আবিষ্কৃত হইবার পর-বৎসরে বেকারেল্ পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে, নব-আবিষ্কৃত ইউরেনিয়ম্ সলফেট (Uranium Sulphate) যদি ঐ কাগজে মোড়া ফোটোগ্রাফির কাচের নিকট অনেকক্ষণ রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ কাচের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া হয়— এক্‌স্-রে আনিলে ঠিক যেরূপ হয়। সুতরাং এই

পদার্থ হইতে একরূপ রশ্মি বাহির হয়—যাহা একস্‌-রের ন্যায় অস্বচ্ছবস্তু ভেদ করিয়া যাইতে পারে। এই সময় ওয়ারস (Warsaw)-বাসী জনৈক রমণী পারিস্ (Paris) এ আসিয়া অঙ্কশাস্ত্রে ও পদার্থবিজ্ঞানে এম্ এ উপাধি গ্রহণ করেন এবং এইখানে পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আচার্য্য কুরি (Curie) র সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধির জন্য ঐ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি দেখিলেন যে, পিচ্‌ব্লেণ্ড (Pitchblende) নামক যে খনিজ পদার্থ হইতে ইউরেনিয়ম্ (Uranium) বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার পরিত্যক্ত অংশ ইউরেনিয়ম্ অপেক্ষা এই অদৃশ্য কিরণ-বিকিরণে অধিক ক্ষমতাশালী; এবং ফোটোগ্রাফির কাচের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য উপায়েও ইনি তাহা প্রমাণ করিলেন। এই অবস্থায় অধ্যাপক কুরি পত্নীর গবেষণায় যোগদান করিলেন। পিচ্ ব্লেণ্ডের পরিত্যক্ত

অংশ যখন ইউরেনিয়ম্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, তখন উহাতে এমন কোন অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত ধাতু আছে—যাহা ইউরেনিয়ম্ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্, এই মনে করিয়া কুরি ও কুরি-পত্নী এই অজানা পদার্থের সন্ধানে ঐ খনিজ পদার্থকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর ইউরেনিয়ম্ বাছিয়া লইয়া বাকী যেটাকে 'ছড়ায়-ঝাঁটায়' ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইতে মিলিল এক পদার্থ—যাহা এই নূতন ক্ষমতাপন্ন কিরণ বিকিরণ করিতে সম ওজনের ইউরেনিয়ম অপেক্ষা লক্ষগুণ ক্ষমতাশালী। এই পদার্থের নাম দেওয়া হইল রেডিয়ম্ (Radium) সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কারের জন্য সেই বৎসরের নোবেল প্রাইজের কতকটা অংশ কুরি-পত্নীকে দেওয়া হয়। প্রতিভায় নারী যে পুরুষের অপেক্ষা হীন নয়, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে রমণীও যে মানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে পারে, সেই প্রসঙ্গে খনা ও কুরি-পত্নীর

নাম যদি উল্লেখ করা যায়, তবে এই উত্তর বোধ হয় শুনিতে হইবে—স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখাইলে তাহার শেষ পরিণাম বৈধব্য এবং প্রমাণস্বরূপ দেখান হইবে, এই ঘটনার দশ বৎসরের মধ্যেই একদিন পারিসের রাজপথে গাড়ীচাপা পড়িয়া অধ্যাপক কুরি প্রাণত্যাগ করেন।

ইউরেনিয়ম্ যে খনিজ পদার্থে থাকে দেখা যায়, কেবলমাত্র তাহাতেই রেডিয়ম্ মিলে, ইহার তাৎপর্য্য কি? একটা কাচের পাত্রে কিছু ইউরেনিয়ম্ রাখিয়া তাহার মুখটা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে দেখা যায়, কিছুকাল পরে ঐ ইউরেনিয়মের কিয়দংশ রেডিয়মে পরিণত হইয়াছে। কালস্রোতে এই রেডিয়ম্ও যে আবার অন্য পদার্থে পরিণত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং সীসা যে ইহাদের শেষ পরিণতি, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ এখন উপস্থিত হইতেছে।

এই বিশ্বে শক্তির অপচয় নাই; একস্থান হইতে যে শক্তি লুপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই পরিমাণ

শক্তি অন্যস্থানে হয় ত অন্যরূপে দেখা দেয়। দেখা যায়, রেডিয়ম্ হইতে অনুক্ষণ যে রশ্মি নির্গত হইতেছে, তাহা তড়িৎ-সংযুক্ত ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি; আরও দেখা যায়, রেডিয়ম্ হইতে তাপ স্বতঃই উদ্ভূত হইতেছে। দিন নাই, রাত নাই, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই যে তড়িৎ ও তাপ অবিরত নির্গত হইতেছে, এক টুকরা রেডিয়মের এই প্রচণ্ড শক্তি কোথা হইতে আসিল? বাহির হইতে এ শক্তি পায় না, অন্ধকার ঘরে একটি পাত্রের মধ্যে বন্ধ করিয়া বাহিরের আলো উত্তাপ প্রভৃতি না পায়, এইরূপ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিলেও ইহার শক্তি বিকিরণ করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। বৈজ্ঞানিক বলেন, রেডিয়মের এটমের মধ্যে যে ইলেক্‌ট্রন-গুলি ঘুরিতেছে, তাহাদের চলিবার ধারা ক্রমাগতই বদলাইয়া যাইতেছে, অন্তরস্থ ইলেক্‌ট্রন্‌দের এই কক্ষ-চ্যুতির ফলে তাহার শক্তির বিকাশ এবং সেই কারণে ইহা পদার্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে আর সোনার মধ্যে

ইলেক্‌ট্রন্ চিরকাল একই ভাবে ঘুরিতেছে, তাই সোনা চিরকালই সোনা আর রেডিয়ম্ আগে ছিল এক, আর পরে দাঁড়াইতেছে আর এক্ পদার্থে।

কিন্তু এক পদার্থে যে পরিবর্ত্তন আপনা আপনি হইতেছে, অন্য পদার্থে মানুষ যে তাহা একদিন জোর করিয়া করিবে, বিজ্ঞান সে আশা করে। বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা তেল ও বাতাসের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটাইয়া মানুষ যেমন মটরগাড়ী চালাইতেছে, সেইরূপ আপাততঃ অজ্ঞেয় এক উপায় দ্বারা একদিন হয় ত সোনার অন্তরস্থ ইলেক্‌ট্রন্‌দিগকে কক্ষচ্যুত করিয়া তজ্জনিত শক্তিকে আপনার কাজে লাগাইবে। তখন বোম্বাই মেলএর ইঞ্জিন্ খুলিয়া এক টুকরা সোনা লাগাইয়া দেওয়া হইবে, বোম্বাই পৌছিয়া দেখা যাইবে, সেটি সীসায় পরিণত হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তনজনিত শক্তি একটি প্রকাণ্ড ট্রেণকে ঘণ্টায় ৬০ মাইল হিসাবে কলিকাতা হইতে বোম্বাই লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে।

অনেক বড় চিকিৎসক মনে করেন, রেডিয়ম্ দ্বারা কান্‌সার (Cancer) এর ন্যায় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরাম করা যাইতে পারে। সকল চিকিৎসক সে বিষয়ে একমত হইয়াছেন কি না জানা নাই, তবে রোগ না সারুক, ক্রমাগত রেডিয়মম্ ব্যবহারে রোগ যে হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সোনা ও সীসার মধ্যে যে দামের তফাৎ, রেডিয়ম্ ও সোনার মধ্যে পার্থক্য তাহার অনেক গুণ বেশী। প্রথম যখন রেডিয়ম্ আবিষ্কৃত হয়, তখন পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় ধনী এক এক টুকরা কিনিয়া নিজেদের বাড়ীতে রাখিয়া দেন। তাঁহাদের কোন কাজে আসিবে বা ইহা লইয়া কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিবেন বলিয়া নয়, ইহার দাম এত চড়া বলিয়া। কিন্তু শুধু আত্মতুষ্টির জন্য ধনী যাহা সংগ্রহ করিল, বৈজ্ঞানিকের হাতে তাহা অঘটন ঘটাইল। সম্প্রতি লর্ড র‍্যালের (Lord Rayleigh)র পুত্র ষ্ট্রুট্ (Strutt) সরিষা ভোর রেডিয়ম্ দিয়া এক ঘড়ী

স্বতঃ উদ্ভূত শক্তি দ্বারা ত্রিশ হাজার বৎসর চলিবে—অবশ্য যদি ঘড়ির অন্যান্য অংশ তত দিন অবধি ঠিক থাকে।

বেশী পরিমাণ রেডিয়ম্ পৃথিবীতে এখনও পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন,—এক ডেলা রেডিয়ম্ যোগাড় করিতে পারিলে তিনি তদ্দ্বারা কলিকাতার মত সহরের আলো জ্বালা ট্রাম চালানর ভার হাজার হাজার বৎসরের জন্য লইতে পারেন।

৬

গুটীপোকার চাষ ও রেশম তৈয়ারি তখন ফ্রান্সের এক প্রধান ব্যবসা; হঠাৎ গুটীপোকার মড়ক দেখা দিল; সমস্ত দেশময় মড়ক ছড়াইয়া পড়িল—এত বড় এক ব্যবসা, দেশের এত বড় এক সম্পদ্ লোপ পাইবার উপক্রম হইল; প্রতীকারের কোন উপায় ঠিক হয় না। তখন রসায়নবিৎ বলিয়া পাস্তরের (Pasteur) নাম হইয়াছে। লোকে পাস্তরের উপর এই মড়কের কারণ অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিল। অণুবীক্ষণের তলে একটি দুষ্ট গুটী-পোকা রাখিয়া পাস্তর দেখিলেন, সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম অগণিত পোকা উহার মধ্যে কিল্‌বিল্ করিতেছে; ইহারা এত ছোট যে, শুধু চোখে ধরা পড়ে না। এই কীটাণুগুলিই তৈয়ারি করিয়াছেন—যাহা বিনা দমে রেডিয়মের এই

যে গুটীপোকার রোগের কারণ, পাস্তুর এই অনুমান করিলেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল বীজাণু মারিবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইল; গুটীপোকার মড়ক অচিরে থামিয়া গেল; ফ্রান্সের রেশম-ব্যবসা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

গুটীপোকার রোগের মূলে যখন এই ক্ষুদ্র কীটাণু আছে, তখন এই জাতীয় কীটাণু যে মানবের ব্যাধির কারণ, পাস্তুর অনুমান করিলেন, এবং পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিয়া গেলেন। ঘোড়া-গরুর এক রকম মারাত্মক ঘা হয়, তাহাকে এন্থ্রাক্স্ (anthrax) বলে এবং কাঁচা চামড়ার ব্যবসা যাহারা করে, তাহাদের মধ্যেও এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পাস্তুর ঐ ব্যাধিগ্রস্ত কোন লোকের রক্ত অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন; উহাতে রাশি রাশি একপ্রকার জীবাণু পাওয়া গেল। ঐ রোগাক্রান্ত যে কোন লোক বা যে কোন পশুর রক্ত দেখা হইল,

তাহাতেই ঐ একই রকমের জীবাণু মিলিল। সুতরাং ঐ জীবাণুই যে এন্থ্রাক্স্ রোগের কারণ, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটা কথা এখানে উঠিতে পারে যে, যেটাকে কারণ বলিয়া মনে করা হইতেছে, সেটা হয় ত কারণ নয়—কার্য্যের ফল। ক্ষুধা বোধ করিলে শিশু কাঁদিতে থাকে এবং সকল শিশু ইহা করে। তাহা বলিয়া কান্নাটা তো শিশুর ক্ষুধার কারণ নয়; পাস্তুর এ কথা বুঝিতেন, তাই পরীক্ষাটা এবার তিনি অন্য রকমে আরম্ভ করিলেন। ঐ এন্থ্রাক্স্ ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির জীবাণু-মিশ্রিত এক ফোঁটা রক্ত কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশাইয়া দিয়া দেখিলেন, ঐ সুস্থ ব্যক্তিতে ঐ ব্যাধির সকল লক্ষণ দেখা দিল। পাছে এখানেও কথা উঠে যে, পোকা-গুলি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, বিষ শুধু রক্ততে আছে এবং পোকার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষাক্ত রক্ত শরীরমধ্যে চালনা করিয়া দেওয়ার ফলে ঐ ব্যাধির আবির্ভাব,

তাই পাস্তুর জীবাণুগুলিকে রক্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া উহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া পূর্ব্বমত ফল পাইলেন। দু এক স্থলে যে ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার কারণ এই, ফসলের জন্য ভাল বীজও যেমন প্রয়োজনীয়, উর্ব্বর ক্ষেত্রও ততোধিক আবশ্যক। এখন দেখা গিয়াছে, সুস্থ সবল বলিষ্ঠ দেহে জীবাণু বিজ্-বিজ্ করিতেছে, কিন্তু রোগের কোন চিহ্ন নাই ; হঠাৎ আহার-নিদ্রার অনিয়মে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর দুর্ব্বল হইল, অমনি ঐ জীবাণুগুলি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। যে মাটী শক্ত বলিয়া এক দিন তাহারা দাঁত বসাইতে পারিতেছিল না, হঠাৎ সেই মাটী নরম হওয়ায় তাহারা আপন আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল।

পাস্তুর এইবার জীবাণু লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, এন্থ্রাক্স্ জীবাণুকে বহুক্ষণ উত্তপ্ত করিয়া রাখিলে উহার কার্য্যকরী শক্তি অনেক

কমিয়া যায় এবং তখন কোন জন্তুর শরীরের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে উহা মোটেই মারাত্মক হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা উত্তাপে রাখা হইয়াছে, এইরূপ এন্‌থ্রাক্স্ জীবাণু একটি ভেড়ার দেহে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল, ব্যাধির সামান্য একটু আধটু লক্ষণ দেখা দিল মাত্র, আর কিছু হইল না। উহার পনর দিন পরে বার ঘণ্টা উত্তাপে রাখা হইয়াছে, এইরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর জীবাণু আবার সেই ভেড়ার রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইল, বিশেষ কিছু দেখা গেল না। আবার পনর দিন পরে ঐ ভেড়ারই দেহে সাধারণ জীবাণু দেওয়া হইল—তাহার বেশ সহিয়া গেল, কিন্তু ইহাই অন্য যে কোন সাধারণ ভেড়ার পক্ষে সাঙ্ঘাতিকরূপে মারাত্মক। সংসারক্ষেত্রেও আমরা দেখি, আফিংএর যে মাত্রা বিবাহযোগ্য বয়সোত্তীর্ণা কুমারীর পক্ষে যথেষ্ট, তাহাই একদিন না পাইলে পাকা আফিংখোরের হাই উঠে।

পাস্তুর আরও দেখিলেন যে, কোন বিশিষ্ট জীবাণুকে কোন বিশিষ্ট জাতীয় জন্তুর দেহে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া যায় তো ইহার তীব্রতা ইচ্ছামত বাড়ান বা কমান যায়। কোন নাতিতীব্র জীবাণু যদি শরীরের মধ্যে চালনা করিয়া দেওয়া যায় তো ঐ জীবাণু-জনিত রোগ স্বল্পপরিমাণে শরীরে দেখা দেয় বটে, কিন্তু ঐ রোগের মারাত্মক আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পাইয়া যায়। ভ্যাক্‌সিন্ (Vaccine) চিকিৎসায় এই তথ্যই নিহিত আছে এবং বর্ত্তমান কালে ভ্যাক্‌সিন্ চিকিৎসকের একটি প্রধান সহায়।

পাগ্‌লা কুকুর বা কোন জন্তু কামড়াইলে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু একরূপ অনিবার্য্য। কিন্তু মৃত্যু তৎক্ষণাৎ ঘটে না, প্রায় চল্লিশ দিনের পূর্ব্বে শরীরে ঐ প্রাণঘাতী বিষের কার্য্য দেখা দেয় না। এই সময়ের মধ্যে যদি দিনের পর দিন খুব ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ জাতীয় খুব তীব্র বিষ শরীরের মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া

দেওয়া যায়, তাহা হইলে চল্লিশ দিন পরে যখন ঐ জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিতে আসিবে, তখন সে দেখিবে, তাহাকে বাধা দিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া আছে এবং তখন আর তাহার দাঁত ফোটাইবার সামর্থ্য থাকিবে না।

পাস্তুরের পূর্ব্বে সত্যকার পাগ্‌লা কুকুরে কামড়াইলে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল, আর এখন পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউসন্ (Pasteur institution)এ চিকিৎসিত হইলে মৃত্যু একেবারেই অসম্ভব।

একটি রাখাল-বালককে বাঘে কামড়ায়, তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত প্রণালীতে পাস্তুর ঐ বালকের প্রাণদান করেন। এই রাখাল-বালকই পাস্তুরের প্রথম রোগী। তাই ফ্রান্সের পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটের সম্মুখে একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত করা হইয়াছে—একটি বালক বাঘের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

পাস্তুর নিজে চিকিৎসক ছিলেন না; তাঁহার এক

প্রধান শিষ্য লর্ড লিষ্টার (Lord Lister) তাঁহার সিদ্ধান্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে লাগাইয়া আন্টিসেপ্টিক্ (antiseptic) ও আসেপ্টিক (aseptic) অস্ত্রচিকিৎসা সৃষ্টি করিলেন। রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা জীবাণু মারিয়া ফেলিয়া লিষ্টার ক্ষত-স্থান শীঘ্র আরাম করিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বে শস্ত্রচিকিৎসা করিলেই যেমন ক্ষতস্থানে জীবাণুর প্রবেশ দ্বারা সমস্ত স্থানটা ফুলিয়া উঠিত, লাল হইত, এই জীবাণু-গুলিকে মারিতে আসিয়া শরীরের শ্বেত রক্তকণিকা নিজেদের প্রাণ দিয়া পুঁজে পরিণত হইত এবং অত্যধিক জ্বর আনিয়া রোগীর প্রাণসংশয় করিত, এখন নানা উপায়ে ঐ জীবাণুর আগমন বন্ধ হওয়ায় কাটাকুটি সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া গেল। তাই এখন বলা হয়, নেপোলিয়ান তাঁহার সমস্ত যুদ্ধে যত না লোক মারিয়া-ছিলেন, লিষ্টার প্রতি বৎসর তত লোকের প্রাণদান করিতেছেন।

কিন্তু মানব ইতিহাসে সকল দেশের সকল সময়ের

সকল চিকিৎসকের উপর পাস্তুরেরই নাম থাকিবে, যিনি নিজে চিকিৎসক না হইলেও ব্যাধিগ্রস্ত মানবের কল্যাণসাধনে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন এবং যাঁহার আবিষ্কৃত উপায় বর্ত্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৭

পানামা খাল কটিলেন পাস্তুর। যদিও পাস্তুর সে সময়—ইহলোকে ছিলেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে ফরাসীরা একবার পানামাতে খাল কাটিতে যায়, অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসে। জাতির এই কলঙ্ক ফরাসীবাসী পাস্তুর দ্বারা মোচিত হইল। পানামাতে খাল কাটা হইল তখন—যখন সে স্থান হইতে সমস্ত ব্যাধি দূরীকৃত হইল; এবং তাহা সম্ভব হইল পাস্তুর-প্রদর্শিত পথঅবলম্বনে।

পাস্তুর একদিন বলিয়াছিলেন যে, বীজাণুজনিত ব্যাধি এই ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাড়াইবার ক্ষমতা মানবের আছে। মানবের এ ক্ষমতা পাস্তুর দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু এ ক্ষমতা মানব অর্জ্জন করিয়াছে এবং পৃথি-

বীর অনেক স্থান হইতে দু'একটা ব্যাধি একেবারে নিষ্কাশিত হইতেছে।

ম্যালেরিয়া (Malaria) কথাটার আসল মানে খারাপ বাতাস ; পূর্ব্বে ধারণা ছিল, খারাপ বাতাস হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি। পাস্তুরের এক শিষ্য দেখাইলেন যে, সে সব কিছু নয়, জীবদেহে রক্তের মধ্যে এক রকম জীবাণু দেখা দেয়, তাহারাই ম্যালেরিয়ার কারণ। আরও দেখা গেল, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে কুইনাইন (Quinine) খাওয়াইলে ঐ জীবাণু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়, রোগী সুস্থ হয়। কিন্তু এই জীবাণু কোথা হইতে কিরূপে শরীরে প্রবেশ করে ? অনেক অনুসন্ধানের পর রণাল্ড রস্ (Ronald Ross) দেখিলেন, এক জাতীয় মশা এই সকল জীবাণুকে দেহ হইতে দেহান্তরে পরিচালিত করে। ইটালী হইতে ম্যালেরিয়ারোগীকে কামড়াইয়াছে, এইরূপ মশা আনাইয়া সেই মশা ম্যালেরিয়াশূন্য লণ্ডনে কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট ছাড়িয়া

দেওয়া হইল। মশা তাহাকে কামড়াইল, কয়েকদিনের মধ্যে তাহার ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ম্যালেরিয়া যে মশা দ্বারা চালিত হয়, এ আবিষ্কারের জন্য এক বৎসরের নোবেল প্রাইজ রস্‌কে দেওয়া হয়। কুইনাইন দিয়া ব্যাধির প্রতীকার করা অপেক্ষা এই মশা মারিয়া ব্যাধির আক্রমণ রোধ করাটা যে শ্রেয়ঃ, সেটা না বলিলেও চলে; কিন্তু কামান না দাগিয়াও যে মানব এই মশা মারিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্থল একমাত্র পানামা নয়। ইটালীতে যেখানে বৎসরে ১৬০০০ হাজার লোক মারা যাইত, সেখানে এখন মৃত্যুসংখ্যা ৪০০০ হাজারে নামিয়া আসিয়াছে। গ্রীসে ম্যারাথন (Marathon) এ দুই বৎসরের মধ্যে মৃত্যু-হার শতকরা নব্বুই হইতে দুইএ পৌছিল। পশ্চিম আফ্রি-কার যে সব স্থান একদিন 'সাদা মানুষের গোর' ছিল, এখন সে সকল স্থান স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে। কোলোন (Colon), রাইও ডি জেনিরা (Rio de Janeira), হাভানা (Havana), কিউবা (Cuba),

ফিলিপাইন (Philippine) দ্বীপ ম্যালেরিয়াশূন্য হইতে চলিল। আর ভারতবর্ষে—প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ লোক জ্বরে প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং অধিকাংশ স্থলে সে জ্বর ম্যালেরিয়া। সম্রাট্ ও সম্রাট্-পত্নী যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন সার-রণাল্ড রস্ ভারতবর্ষের এই ব্যাধি সম্বন্ধে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ভারত-গভর্মেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে; গত বৎসর বাঙ্গালা দেশের স্যানিটারি কমিশনার (Sanitary Commissioner) বেণ্টলি (Bentley) সাহেবের নব উদ্ভাবিত উপায়ে মশা মারিবার জন্য বর্দ্ধমানে ও জঙ্গীপুরে দুইটি গ্রাম ঠিক করা হইয়াছে এবং কাজও সেখানে চলিতেছে। কিন্তু যে ব্যাধি প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোককে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতেছে এবং কোটী কোটী লোককে 'স্ফূর্ত্তিহীন, নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, উৎসাহহীন, বিমর্ষ এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমে অক্ষম' করিয়া তুলিতেছে, তাহার প্রতীকারকল্পে দেশবাসীর মধ্যে যে চেষ্টা, যে আয়োজন, যে অর্থব্যয় আবশ্যক, তাহা কোথায়?

বিজ্ঞান-বলে মানবের এ শত্রুকে যে বিনাশ করা যায়, নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। চাই এখন গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর মধ্যে সম্মিলিত চেষ্টা। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা বলেন, গ্রীসের পতন আরম্ভ হইল তখন—যখন সেখানে ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করিল। ঐতিহাসিক ঘটনা পুনঃপুনঃ ঘটিতে দেখা যায়। গ্রীসের পক্ষে এক সময় যাহা সত্য হইয়াছিল, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সত্য হইয়া না দাঁড়ায়, তজ্জন্য দেশবাসিমাত্রকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ত চাই-ই, দেশবাসীর এ বিষয়ে যথেষ্ট করিবার আছে। প্রত্যেক গৃহস্থকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ম্যালেরিয়া যে কোন স্থান হইতে বিদায় করা যায়, পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহারা তাড়াইয়াছে, তাহারা আমাদেরই মত মানুষ। পানামায়, ইটালীতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি এখানে গ্রামের প্রতি গৃহস্থ

আপনার স্ত্রী-পুত্র-রক্ষার জন্ম অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। এতৎসম্বন্ধে এই কয়টি সহজসাধ্য বিষয়ে প্রত্যেক গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়াশূন্য করা সুদূরপরাহত হইবে না।

"(১) এনোফেলিস্ মশক তৃণ-গুল্ম-সমাকুল পুষ্করিণী, খানা-ডোবা বা যেখানে কোন স্থানে বা পাত্রে আবদ্ধ জল দেখে, সেইখানেই ডিম্ব প্রসব করে। সেই ডিম্ব হইতে এনোফেলিস্ মশক উৎপন্ন হইয়া ম্যালেরিয়া-বিস্তারের সহায়তা করে।

পুষ্করিণী হইতে তৃণ-গুল্ম ও আগাছা তুলিয়া দিলে মশক আর তাহাতে ডিম্ব পাড়িবে না। পুষ্করিণীতে মাছ ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। মাছেরা মশক-শাবকগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। খানা-ডোবায় মাছ ছাড়া যায় না বলিয়া সেইগুলিকে বুজাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যদি বুজাইয়া ফেলা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সেইগুলিকে যথাসম্ভব আগাছাশূন্য করিতে হইবে এবং যদি সঙ্গতি

থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কেরোসিন্ তৈল সপ্তাহে দুই একবার করিয়া ফেলিলে মশক জন্মিবে না। বর্ষার সময় কোন পাত্র খোলা রাখিবে না। তাহাতে যদি জল জমিয়া থাকে, বৃষ্টির পর সেই জল ঢালিয়া ফেলিবে ও পাত্রটিকে উপুড় করিয়া রাখিয়া দিবে।

(২) জঙ্গল, আবর্জ্জনা ও গাছপালার ভিতর মশকগণ আশ্রয় লইয়া থাকে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহারা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। মশকগুলি ২০০ শত হাতের বেশী উড়িয়া আসিতে পারে না। অতএব বাটী হইতে চতুর্দ্দিকে ২০০।৩০০ শত হাতের ভিতর যত গাছপালার ঝোপজঙ্গল সাফ করিয়া ফেলিবে।

(৩) সন্ধ্যার সময় হইতে গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে মশক দংশন করিতে পারে না।

(৪) মশকাধিক্য হইলে সন্ধ্যার পর হইতেই মশারির ভিতর বসিয়া কাজকর্ম্ম করা যুক্তি-যুক্ত।

(৫) ধূনা ও গন্ধক পোড়াইলে মশক পলাইয়া যায়। ইহার দ্বারাও মশকের হাত হইতে কিঞ্চিৎ নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে।

(৬) ম্যালেরিয়ার সময় মশারির ভিতর ব্যতীত শয়ন করিবে না। মশারি ছেঁড়া থাকিলে তাহা মেরামত করিয়া লওয়া আবশ্যক। মশারির ধার বিছানার তলায় ভালরূপে গুঁজিয়া রাখা উচিত।

(৭) হাত-পাখার সাহায্যেও সন্ধ্যাকালে মশক তাড়াইতে পারা যায়।

(৮) যখন গ্রামে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তখন প্রতি সপ্তাহে একদিন ৮।১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন নিয়মিত খাওয়া উচিত।

(৯) যদি উল্লিখিত নিয়মগুলি পালন করা সত্ত্বেও একদিন হঠাৎ শরীর খারাপ বোধ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় ৮।১০ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করিবে; তাহা হইলে যে সকল ম্যালেরিয়া-জীবাণু পূর্ব্বেই

শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

(১০) কুইনাইন-সেবনে শরীরের কোনই ক্ষতি হয় না। কুইনাইন্ ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ। ম্যালেরিয়া-রোগীকে ১০।১২ গ্রেণ কুইনাইন্ খাওয়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। কুইনাইন্-প্রয়োগ দ্বারা যত শীঘ্র সম্ভব ম্যালেরিয়া-রোগীকে আরোগ্য করিবে ; নচেৎ মশক দ্বারা সেই রোগী হইতে অপর ব্যক্তি আক্রান্ত হইবে। ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইলে রোগীরও ক্ষতি হইবে এবং অপর সকলেরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।"— হরিনাভি হিতসাধন-মণ্ডলী—পত্রিকা সংখ্যা ১।

৮

ঝড়-বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, গরম এ সকলের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যে এ দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, খনার বচন তাহার প্রমাণ। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল চন্দ্র হইতে দূরে হইলেই যে অবিলম্বে বৃষ্টি হইবে, তাহার কারণ না হয় খুঁজিয়া নাই পাওয়া যাউক, কিন্তু তাহা দৈবাৎ ভিন্ন তো ঘটিতেও দেখা যায় না। নেপোলিয়ান তাঁহার ক্ষমতার চরম সীমায় পৌছিয়া যখন রুসিয়া জয় করিতে মনস্থ করেন, তখন তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস্ (Laplace) কে জিজ্ঞাসা করেন, সেই বৎসর কোন্ সময় রুসিয়ায় শীতের প্রখরতা খুব বেশী হইবে? লাপ্লাস্ অনেক অনুসন্ধান করিয়া অনেক হিসাব করিয়া বলিয়া দিলেন যে, জানুয়ারীর পূর্ব্বে প্রবল

শীত দেখা দিবে না। নেপোলিয়ান তদনুযায়ী রণযাত্রায় বহির্গত হইলেন। সেবার ডিসেম্বরেই শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল; নেপোলিয়ানের রুসিয়া-জয় তো হইলই না, তাঁহার বিরাট্ বাহিনী একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

দোষ লাপ্লাসের নয়। কারণ, ঋতুতত্ত্ব (Meteorology) তখনও বিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আসে নাই। একশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনও যে সম্পূর্ণরূপে আসিয়াছে, তাহা নয়। কিন্তু তবুও ইহার কোন কোন বিভাগকে বিজ্ঞান এখন অনেকটা পরিমাণে তাহার আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছে। দু'একটা বিষয়ে দেখা যায়, আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী দৈবাৎ মিলিত, এখন তাহা দৈবাৎ গরমিল হয়।

সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে; পাক্ খাইয়া ঘুরিতেছে—তাই দিন-রাতের উত্তাপ বিভিন্ন আর কাৎ হইয়া ঘুরিতেছে, তাই এককালে গরম আর এককালে

শীত। পৃথিবীর ঠাণ্ডা গরম যদি শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব সোজাই হইত এবং চট্ করিয়া তাহাকে একটা হিসাবের মধ্যে আনিয়া ফেলা যাইত। কিন্তু সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ পৃথিবী পাইতেছে, তাহা ইহা ছাড়া আরও অনেক জিনিষের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবী পঞ্চাশ মাইল পুরু একটা বাতাসের ওড়না গায়ে দিয়া আছে, সেই ওড়না ভেদ করিয়া সূর্য্যকিরণকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহার পর সাদা জিনিষের আর কালো জিনিষের উত্তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ভিন্ন। তাহার পর খানিকটা উত্তাপ পাইলে জল যতটা গরম হয়, পাথর তদপেক্ষা বেশী গরম হয়। এটা হইল শুধু পাওয়ার দিক্‌টা; কিন্তু জমাখরচ বাদ দিয়া যেটা থাকে, সেইটাই হইল আসল পুঁজি। পৃথিবী যে উত্তাপ পাইতেছে, সেটা তো সবটা রাখিয়া দিতে পারিতেছে না; খানিকটা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। যেটা ছাড়িয়া দিতেছে, সেটাও আবার অনেক জিনিষের

উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্যাপারটা এতই জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, গণিতের গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে ফেলা বড়ই শক্ত।

কিন্তু দু'এক বিষয়ে বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী যে মিলিতেছে, তাহার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং সে কৃষি চাতকের ন্যায় আকাশের বৃষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে; এক বৎসর বৃষ্টি না হইলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থায় বৃষ্টির আগমনবার্ত্তা যদি পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞান দিতে পারে তো দেশের বড় অল্প লাভ হয় না। এখন মন্‌সুন্ (Monsoon) এর আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞান অনেক পূর্ব্বে বলিয়া দিতেছে এবং সে সংবাদের উপর নির্ভর করিলে বড় ঠকিতে হয় না। এই মন্‌সুনের আসার সময়টা যে গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে ব্যারোমিটার (Barometer) এর পারা কতটা উঠে, মে মাসে হিমালয়ে কতটা বরফ পড়ে, পূর্ব্ব-বৎসর সমগ্র ভারতে কতটা বৃষ্টি

পড়িয়াছিল—এই সকলের উপর যে নির্ভর করে, সেটা যেন একরকম বোঝা যায়; কিন্তু উহা যে মরিসস্ (Mauritûs) ও জাঞ্জিবার (Zanziber) এ বাতাসের চাপের উপর নির্ভর করে এবং এ দফাটা যে বাদ দিলে সমস্তটা গরমিল হইয়া যায়, এটার আবিষ্কারই বর্ত্তমান মিটিয়রলজিরই (meteorology) প্রধান কৃতিত্ব; এবং এ আবিষ্কারটা সম্ভব হইয়াছে সেই যুগে—যখন ভারতবর্ষে বসিয়া তখনি তখনি পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের রোদবৃষ্টির সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে।

৯

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন (Boston) নগরে একটা সরু গলীর মধ্যস্থিত একটা দোকান-ঘরে স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী একটি যুবক আলেক্‌জাণ্ডার গ্রেহাম্‌ বেল (Alexander Graham Bell) একটি যন্ত্রের সাম্‌নে মুখ রাখিয়া বলিল, "ওয়াটসন্‌ (Watson), এখানে এস", অমনি তিনতালা হইতে তাহার বন্ধু ওয়াটসন্‌ দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া বলিল—"আমি শুনিতে পাইয়াছি, সব কথা শুনিতে পাইয়াছি।"

মুখের উচ্চারিত কথা অনুযায়ী কোন পদার্থ যদি নড়িতে থাকে এবং নড়ার তারতম্য যদি খুব সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারা যায় তো যাহারা কানে শুনিতে পায় না,

চোখে দেখিয়া শব্দ ধরিবার একটা ক্ষমতা তাহাদিগকে দিতে পারা যায়। বেল্ প্রথম এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছিলেন। অনুসন্ধান কতকদূর অগ্রসর হইলে তিনি সম্পূর্ণ এক নূতন দিকে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থির ধারণা হইল যে, যন্ত্র দ্বারা মানুষের কথা অবিকৃতভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত করা সম্ভব। বেল্ যখন এ কথা বন্ধুবান্ধবদের গোচরে আনিলেন, তখন সকলেই তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। যাহারা এতদিন আর্থিক সাহায্য করিতেছিল, তাহারা সাহায্য বন্ধ করিল এবং তাঁহার ভাবী শ্বশুর মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ সব পাগ্‌লামী না ছাড়িলে তিনি কন্যাদান করিবেন না। কার্য্যে নিরুৎসাহ করিবার পক্ষে ইহার একটি বাধাই যথেষ্ট; কিন্তু বেল্ নাছোড়বান্দা। তিনি তাঁহার এ খেয়াল লইয়াই রহিলেন এবং নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া অনেক বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম

করিয়া এক যন্ত্র তৈয়ারি করিলেন—যাহার একদিকে যেমন কথা বলা হইল, অন্য দিক্ হইতে ঠিক সেই কথা শোনা গেল।

এই টেলিফোন্ (Telephone)এ যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা মোটামুটি এই;—সূতার যেরূপ কাটিম থাকে, মনে করা যাউক, সূতা জড়ান তারের সেইরূপ একটি কাটিম আছে এবং তারের মুখ দুইটা একসঙ্গে জড়ান। ঐ কাটিমের নিকটে একটি চুম্বক যদি আনা যায় তো ঐ তারের মধ্যেক্ষণিকের জন্য একটি তড়িৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়, চুম্বকটি সরাইয়া লইলে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। আরও দেখা যায়, তড়িৎপ্রবাহযুক্ত তারের এইরূপ একটা কাটিম চুম্বকের ন্যায় কাজ করে, নিকটে লৌহ থাকিলে উহাকে টানিয়া আনে, চুম্বককে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে আর এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই দুইটা বিষয়

স্মরণ রাখিয়া মনে করা যাউক, দুই স্থানে দুইটি তারের কাটিম আছে এবং এ কাটিমের এক একটি মুখ ও কাটিমের এক একটি মুখের সহিত দুইটা লম্বা তার দিয়া সংযুক্ত। প্রত্যেক কাটিমের মধ্যে একটি করিয়া চুম্বক-দণ্ড আছে এবং সম্মুখে একটি করিয়া খুব পাতলা লোহার পর্দ্দা, এত পাতলা যে, অল্পেই কাঁপিতে থাকে। মনে করা যাউক, প্রথম পর্দ্দার নিকট একজন কথা কহিতেছে এবং দ্বিতীয় পর্দ্দার সামনে আর একজন কান পাতিয়া আছে। প্রথম ব্যক্তি যেমন কথা কহিল, অমনি তাহার মুখের সম্মুখস্থ বাতাসে নানা রকমের ঢেউ উঠিতে লাগিল, এই ঢেউগুলি লোহার ঐ পাতলা পর্দ্দার উপর পড়িয়া পর্দ্দাটাকে কাঁপাইয়া তুলিল; এই পর্দ্দা কিন্তু চুম্বকের সন্নিকটে থাকায় চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। ইহা কাঁপিতে থাকায় একবার ঐ কাটিমের কাছে আসিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে

ঐ কাটিমের মধ্যে তড়িৎ একবার এদিকে, একবার ওদিকে উদ্ভূত হইতেছে। কিন্তু কাটিম দুইটি পরস্পর সংযুক্ত, সুতরাং এই বিদ্যুৎপ্রবাহ সমভাবে অপরদিকের কাটিমেও চালিত হইতেছে; কিন্তু এই দ্বিতীয় কাটিমের সম্মুখেও পাত্‌লা লোহার পর্দ্দা আছে এবং চুম্বকের নিকট থাকায় চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে; সুতরাং ইহা একবার কাছে আসিতেছে, একবার হঠিয়া যাইতেছে; প্রথম পর্দ্দাটি যেমন নড়িতেছিল, এটাও ঠিক সেইরূপ নড়িতেছে। পর্দ্দাটি নড়ায় পর্দ্দার সম্মুখের বাতাসটাও কাঁপিতেছে, ওদিকের মুখের নিকটে যেরূপে কাঁপিতেছিল; এবং এই কম্পমান বাতাস দ্বিতীয় ব্যক্তির কানের মধ্যে পৌছিয়া শ্রুতির অনুভূতি জাগাইতেছে।

শুধু কথা আর টেলিফোনের কথার মধ্যে তফাৎ এই—শুধু কথা কহিলে মুখের সম্মুখে বাতাসের যে তরঙ্গ উঠে, সেটা সটান্ চলিয়া আসিয়া কানে পৌছায়, আর

টেলিফোনে সেই তরঙ্গ প্রথম একটা লোহার পর্দ্দাকে দোলাইয়া দেয়, তাহার ফলে বিদ্যুতের উৎপত্তি—সেই বিদ্যুৎ তার দিয়া বরাবর চলিয়া আসে, দ্বিতীয় স্থানে আসিয়া উহা আর একটি লোহার পর্দ্দাকে দোলাইয়া দেয়, তাহাতে উহার সম্মুখের বাতাসে তরঙ্গ উঠে এবং বাতাসের সেই তরঙ্গ কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। ঐ যন্ত্র আবিষ্কারের অল্পদিন পরে ফিলাডেল-ফিয়া (Philadelphia) নগরে এক বড় প্রদর্শনী হয়। বেল্ তাঁহার নব-অবিষ্কৃত যন্ত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হন। কিন্তু প্রদর্শনীতে কেহই তাঁহার যন্ত্র দেখিতে আসে না। অনেকদিন পরে ব্রেজিল (Brazil) এর সম্রাট্ প্রদর্শনীর বিচারকদিগের সহিত সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি বেল্‌কে চিনিতেন, বেল্ কি আবিষ্কার করিয়াছে, তিনি দেখিতে আসিলেন। বেল্ তাঁহার ঐ যন্ত্রের একদিক্‌টা সম্রাট্‌কে কানের নিকট ধরিতে বলিলেন, এবং কথা

কহিবার জন্য নিজে অপর দিকে আসিলেন; চারিদিকে লোক জমিয়া গিয়াছে, কেহ তখনও জানে না কি হইবে; হঠাৎ সম্রাট্ বিস্ময়ে চেঁচাইয়া উঠিলেন —"কি আশ্চর্য্য! এ যে কথা কয়!" এইবার উপস্থিত সকলে একে একে ঐ যন্ত্র কানে দিতে লাগিলেন। সম্রাটের পর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন (Lord Kelvin) ঐ যন্ত্রটি দেখেন; তিনি বলেন, আমেরিকায় আসিয়া তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, এই টেলিফোন্ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। বধিরদের কথা বুঝিবার উপায় করিতে গিয়া এইরূপে ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার গ্রেহাম্ বেল্ সমগ্র মানবজাতির বলিবার এবং শুনিবার উপায় আশ্চর্য্য রকমে বাড়াইয়া দিলেন। বেলের পর আরও অনেকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা নানা দিকে বাড়াইয়া দিয়াছেন; তাহার ফলে এখন নিউইয়র্ক (New york) হাজার মাইল দূরে চিকাগো (Chicago)র সহিত কথা কহিতেছে।

বৈজ্ঞানিক দেখিল, টেলিগ্রাম্ যখন বিনা তারে চলিতেছে, তখন টেলিফোন্ই বা বিনা তারে চালান যাইবে না কেন? সম্প্রতি এ বিষয়ে সে সফলতা লাভ করিয়াছে এবং দেখা গিয়াছে, এই উপায়ে যে শব্দ পাওয়া যায়, সাধারণ টেলিফোন্ অপেক্ষা তাহা অধিক সুস্পষ্ট। এখন তিন চারি মাইল দূর অবধি বিনা তারে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এখন চলন্ত ট্রেণে চাপিয়া বা এরোপ্লেনে (aeroplane) চড়িয়া মানব তাহার আত্মীয়স্বজনের সহিত কথা কহিতেছে এবং সে দিন বোধ হয়, খুব দূরে নয়—যে দিন টেবিলের এধার ওধারে বসিয়া যেমন কথা কহা হয়, তেমনি এক মহাসমুদ্রের এপার ওপার মধ্যে সহজে কথাবার্ত্তা চলিবে, এবং সে দিন বোধ হয় আসিবে—যে দিন কলিকাতায় বসিয়া একটি কল ঘুরাইয়া 'বন্ধু তুমি কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলে অবিলম্বে উত্তর আসিবে, 'আমি চায়নায় একটা কয়লার খনিতে, বা মেক্সিকো (Mexico)য়

একটা পর্ব্বতে আমার ছুটীর দিন যাপন করিতেছি' এবং কোন উত্তর না আসিলে বুঝিতে হইবে, বন্ধু চায়নায়ও নাই, মেক্সিকোতেও নাই, এ পৃথিবীর কোন স্থানেই নাই।

১০

উড়িবার ইচ্ছাটা মানবের বহুযুগের। চোখের উপর সে দেখিতেছে, কোকিল কুহু কুহু করিয়া, চাতক ফটিক জল বলিয়া, ভ্রমর গুণ্-গুণ্ করিয়া উড়িতেছে; দেখিতেছে, ময়রার দোকানে বোল্‌তা বন্-বন্ করিয়া, ছেঁড়া মশারির মধ্যে মশা ভন্-ভন্ করিয়া এবং তাহার মাথার উপর কাক-চিল ঝটাপট্ করিয়া উড়িতেছে, আর সে শুধু চুপ্-চাপ্ আছে। তাই প্রথম সে কাব্যে, ব্রতকথায়, রূপ-কথায় নানান্ জনকে নানান্ যানে উড়াইল। তাহার পর একদিন ভাবিল যে, দুখানা ডানায় যখন সকল খেচর আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন দুইখানা কৃত্রিম ডানা দিয়া সে-ই বা উড়িতে পারিবে না কেন? সত্য সত্যই নিজের দেহে দুইখানা ডানা লাগাইয়া উড়িতে গেল; কিন্তু তাহার

এই ডানা পিপীলিকার ডানা উঠার মত হইল। পাখা ছাড়িয়া এইবার অন্য উপায় ধরিল। বাতাসের চেয়ে হাল্কা অনেক গ্যাস তো আছে! কোন এক বড় ব্যাগ হইতে বাতাস তাড়াইয়া তৎপরিবর্ত্তে বাতাস অপেক্ষা হাল্কা এই গ্যাস ভরিয়া দিলে ব্যাগটি যদি অত্যধিক ভারী না হয় তো উহা সমপরিমাণ বাতাস অপেক্ষা লঘু হওয়ায় উপরে উঠিতে থাকিবে, এবং বড় রকমের এইরূপ একটা ব্যাগ চাই কি দু পাঁচ জন লোক লইয়াই উপরে উঠিবে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর এইরূপ একটা বেলুনে মেজ (Metz)-বাসী জনৈক ভদ্রলোক প্রথম আকাশে উঠিলেন; ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ফ্রান্স হইতে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বেলুন উঠিল, তাহা ১৩টি লোককে আকাশে তুলিল।

কিন্তু এইরূপে আকাশপথে ভ্রমণে মানবের চলাফেরার বড় একটা কর্ত্তৃত্ব থাকে না; সে একেবারে বাতাসের অধীন, বাতাস যে দিকে চালাইবে, তাহার রথ সেই

দিকেই চলিবে ; তাই ঠিক এইরূপ যানে আকাশে বিচরণ করিবার চেষ্টায় মানব ক্ষান্ত হইল। বাতাসে ইচ্ছামত বেড়াইবার জন্য বাতাস অপেক্ষা ভারি হওয়াই সুবিধাজনক, শুধু এই ভারি জিনিষটাকে বাতাসের মধ্য দিয়া চালনা করিতে হইবে। নৌকা যেমন দাঁড় দিয়া জল কাটাইয়া চলে, সেইরূপ বাতাস কাটাইয়া চলিবার উপায় করিলে বাতাস অপেক্ষা ভারি জিনিষও বাতাস ভেদ করিয়া যাইতে পাবে ; নৌকার সঙ্গে তফাৎ এইটুকু যে, দাঁড় আস্তে আস্তে চলিলে, এমন কি, না চলিলেও নৌকাডুবির কোন আশঙ্কা নাই। কারণ, নৌকা জলে ভাসে, কিন্তু বাতাস কাটাইয়া যাইবার কল বন্ধ হইলে বা আস্তে আস্তে চলিলে সবশুদ্ধ একেবারে ধরণীপৃষ্ঠে। সমস্ত জিনিষটা যত ভারি হইবে, বাতাস কাটাইবার ক্ষমতা তত বেশী হওয়া চাই, এদিকে আবার একটু বেশী ভারি না হইলে হাওয়া-ঝড়ের বিরুদ্ধে যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে ;

অতএব দুইটার মধ্যে একটা আপোষ করিতে হইবে, এবং সমস্ত ব্যোমযানটার গঠন এরূপ করিতে হইবে, যাহাতে বাতাসের বাধা যত সম্ভব কম পায়।

পুকুরে 'ডুব-সাঁতার কাটিবার সময় মাটী ধরিয়া যাইতে পারিলে যাওয়াটা খুব তাড়াতাড়ি হয়; নৌকা যখন নদীর ধার দিয়া চলে, দাঁড়ি তখন দাঁড় ছাড়িয়া একটা লম্বা বাঁশ দিয়া মাটীর উপর ভর দিয়া চলে। মাটীর বদলে জল কাটাইয়া চলিতে অনেক কম জোর পাওয়া যায়; বাতাস কাটাইয়া যাইতে সে জোর আরও অনেক কমিয়া যায়; সুতরাং যে মটরের বাঁকান বাঁকান পাখা হাওয়া কাটাইবে, সেই মটর অত্যধিক শক্তিশালী হওয়া চাই, তবেই উহা বাতাসকে ঠেলা দিয়া বাতাসের মধ্য দিয়া বাতাস অপেক্ষা একটা ভারি জিনিষকে ইচ্ছামত চালনা করিবে। একটা মাছি উড়িবার সময় সেকেণ্ডে ৩০০

বারের অধিক পাখা নাড়ে, তবেই সে তাহার দেহকে বাতাসের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। সুতরাং ব্যোমযানে স্থাপিত পাখাকে অপরিমিত বেগে ঘুরিতে হইবে, তবেই উহা অতবড় এক জিনিষকে বাতাস ভেদ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে এবং যে মটর এই পাখা ঘুরাইবে, তাহা যখন ঐ যানের মধ্যে থাকিবে, তখন উহাকে যথাসম্ভব হাল্কা হইতে হইবে। অতএব হাল্কা অথচ অপরিমিত শক্তিশালী মটরই এই সকল আকাশ-যানের প্রধান অঙ্গ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিন ঘোটক-বলশালী একটি বাষ্পীয় এঞ্জিন (engine) সর্ব্বপ্রথম একটি যানকে আকাশে তুলিল; অনেক দেশে অনেকের হাতে উহার উন্নতি হইতে লাগিল, পরিশেষে ১৯০০ সালে জার্ম্মাণীর কাউণ্ট জেপেলীন এলুমিনিয়ম (aluminium) নির্ম্মিত যে যান তৈয়ারি করিলেন, তাহা তাঁহারই নামে খ্যাত হইয়া ঘণ্টায় ১৮ মাইল বেগে আকাশমধ্য দিয়া চলিল, এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে বাষ্পীয় এঞ্জিন মটর-কারের বেগে

আকাশমার্গে লোকজন বোমা-বারুদ লইয়া অগণিত ব্যোমযান বিচরণ করিতেছে এবং তজ্জন্য মানুষকে রেল পাতিতে হয় নাই, কোন কৃত্রিম রাস্তা প্রস্তুত করিতে হয় নাই।

শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু মহাশয় এক গল্পে লিখিয়াছেন—"২০৮৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। বদরিকাশ্রম হইতে তারহীন বার্ত্তাবহ (Wireless Telegraphy) যোগে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম।...ব্র্যাড্‌শ খুলিয়া দেখা গেল, বদরিকাশ্রম আসাম-হিমালয় খপোত বর্ত্মের (Assam Himalayan aeronautic line) একটি বড় জংশন ষ্টেশন। প্রত্যেক ডাকবাহী খপোত (Mail airship) এখানে থামে।

তারহীন বার্ত্তাবহযোগে তো এখনই আণ্ডামান দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সাধারণ সকল সংবাদ প্রেরিত হইতেছে; খপোতবর্ত্মের জন্য কি ২০৮৩ খৃষ্টাব্দ অবধি অপেক্ষা করিতে হইবে? যেরূপ বেগে

প্রথম যখন চিম্‌নি দ্বারা বাতাসের যোগান বাড়াইয়া দহন-কার্য্য অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন আলো একটু জোরে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর শক্ত মোম বা তরল তেলের পরিবর্ত্তে গ্যাস ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল; কয়লা হইতে লব্ধ গ্যাস বা ক্যালসিয়ম্ কারবাইডের উপর জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে গ্যাস উঠে, সেই এসিটিলেনএর আলোর প্রখরতা মানবকে একেবারে চমৎকৃত করিল। ইতিমধ্যে তড়িৎ বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহা হুলস্থূল আনিয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ও মহারাণী এলেকজেণ্ড্রার বিবাহ উপলক্ষে লণ্ডনে পুলের উপর যে আলো জ্বলিল বা তাহার বহুপূর্ব্বে হম্ফ্রে ডেভি (Hum phrey Davy) অনেকগুলি ব্যাটারি দিয়া যে আলো জ্বালিয়াছিলেন, আলোর প্রখরতা হিসাবে তাহা খুব উচ্চস্থান অধিকার না করিলেও বৈজ্ঞানিককে

এক নূতন পথ দেখাইয়া দিল। ইহার পর গ্যাসের আলো ও বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে এক তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল এবং তাহার অবসান আজও হয় নাই। এখন বিদ্যুৎ আগে আগে যাইতেছে, কিন্তু গ্যাস এত পিছু পড়িয়া নাই যে, উহা একেবারে হটিয়া গিয়াছে বলা যায়!

একটি সরু তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ যাইলে তারটি গরম হইয়া উঠে; বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইলে তারটি অত্যধিক গরম হইয়া ক্রমশঃ আলো বিকিরণ করিতে থাকে। কিন্তু পলিতা যেমন জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়, এইরূপ স্থলে তারটিরও একেবারে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এখন, কোন্ বস্তুর দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়? বাতাসের অক্সিজেনের সহিত উহার সংমিশ্রণের ফলে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এডিসন্ বায়ুনিষ্কাশিত একটি ছোট কাচের গোলকের মধ্যস্থিত একটি খুব সরু প্ল্যাটিনম্ (platinum) তারের মধ্যে তড়িৎ চালনা করিয়া দেখিলেন, উহা দীপ্তি

দিল, কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে পুড়িয়া গেল না। পর-বৎসর সোয়ান (Swan) প্ল্যাটিনম্ পরিবর্ত্তে বাঁশের আঁশ ব্যবহার করিয়া অধিকতর ফল পাইলেন; এবং এডিসন্ ইহাকে ব্যবহারোপযোগী ও সস্তা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে তখন গ্রাম্ (Gramme) এর উদ্ভাবিত ডাইনামো (Dynamo) যন্ত্রে চলৎশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে পরিণত করিয়া সস্তায় বিদ্যুৎ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তখন এরূপ দাঁড়াইল—গ্যাসের আলো লোপ পাইবার উপক্রম হইল, বৈদ্যুতিক আলো ঘরে ঘরে জ্বলিতে লাগিল।

এই সময় অষ্ট্রিয়া (Austria)-বাসী ওয়েল্সব্যাক্ (Welsbach) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক গ্যাসের আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়াইতে লাগিয়া গেলেন। গ্যাস আলো দেয়—গ্যাসের মধ্যস্থিত কারবন্-কণিকা অত্যধিক উত্তপ্ত হওয়ার ফলে, তাই বহুবর্ষ পূর্ব্বে ড্রমণ্ড (Drummund) হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মধ্যে জ্বালাইয়া, উহার দীপ্তিহীন শিখা

ঘড়ির উপর নিবদ্ধ করিয়া অত্যধিক উজ্জ্বল এক আলো পাইয়াছিলেন। ওয়েল্‌স্‌ব্যাক্‌ ড্রমণ্ডের আবিষ্কৃত এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর সূতার একটি জাল থোরিয়ম্‌(thorium)জারকোনিয়ম্‌ (zirconium) প্রভৃতি পদার্থের দ্রাবকে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইয়া এবং গ্যাসের উত্তাপে সূতাটি পুড়াইয়া দিয়া যে ম্যাণ্টেল (mantle) তৈয়ারি করিলেন, তাহা গ্যাসের উপর চড়িয়া বৈদ্যুতিক আলোকের দীপ্তিকে পরাভূত করিল। লোকের নজর তখন এই দিকে পড়িল; এই ম্যাণ্টেল তৈয়ারি করিবার অনেক কারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু দু'এক বৎসর না যাইতে যাইতে সব কারখানাগুলি গণেশ উল্টাইবার উপক্রম করিল। কারণ, ম্যাণ্টেলগুলি এত ভঙ্গুর হইতে লাগিল যে, সামান্য একটু নাড়াচাড়াও সহে না। বিদ্যুতের কাছে গ্যাসের জয় যখন বড় বেশী স্থায়ী হইবার সম্ভব বলিয়া মনে হইল না, তখন হঠাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। ওয়েল্‌স্‌ব্যাক্‌ তখন থোরিয়ম হইতে

ম্যাণ্টেল প্রস্তুত করিতেন; একটা কারখানায় থোরিয়ম অক্সাইড্ পাইয়া তাহা বিশেষ করিয়া পরিষ্কার করিতে গেলেন, মনে করিলেন, তাহাতে আলোর জোর আরও বাড়িবে; কিন্তু বাড়া দূরে থাকুক, তাহাতে আলো একেবারে মিড়মিড় করিতে লাগিল। কেন এরূপ হইল? ওয়েল্‌স্‌ব্যাক্ ভাবিলেন, পরিষ্কার করিবার সময় এমন একটা জিনিষ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা থোরিয়মের সহিত সামান্য পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিয়া আলোর তেজ বাড়াইত। দেখা গেল, তাহাই বটে; এবং সিরিয়ম (Cirium) সেই পদার্থ। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন ওয়েল্‌স্‌ব্যাক্ ৯৯ ভাগ থোরিয়ম অক্সাইড্ ও এক ভাগ সিরিয়ম মিশাইয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল নয় অথচ একেবারে ভঙ্গুর নয়, এইরূপ এক ম্যাণ্টেল প্রস্তুত করিলেন, তখন গ্যাসের আবার সুদিন ফিরিল। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কর্ত্তারা এতদিন চুপ করিয়া থাকেন নাই, এখন ওয়েল্‌স্‌ব্যাক্‌ও তাহাদের দলে যোগ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে

জার্ম্মাণীতে নার্ন্‌ষ্ট (Nernst) ঐ সকল দুষ্প্রাপ্য পদার্থ বিশিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া, তন্মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ করিয়া খুব উজ্জ্বল আলো পাইয়াছিলেন। বাঁশের আঁশের পরিবর্ত্তে এই সকল ধাতু লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ওয়েল্‌স্‌ব্যাক্‌ দেখিলেন, অস্‌মিয়ম (Osmium) ব্যবহারে সমপ্রখর আলোকের উৎপাদনে তড়িতের খরচ ঠিক অর্দ্ধেক পড়ে। ১৯০৪ সালে অস্‌মিয়ম বাতি দেখা দিল এবং অচিরেই বাজার ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল; কিন্তু বৎসর পার না হইতে হইতে ট্যান্টালম (Tantalum) আসিয়া অস্‌মিয়মের স্থান অধিকার করিল। ট্যান্টালমেরও প্রাধান্য বেশী দিন টিকিল না, টঙ্গষ্টেন্‌ (Tungsten) তাহার স্থান দখল করিল। ইহাতে আলোর তেজ তো বাড়িলই, তড়িতের খরচও আরও অর্দ্ধেকে দাঁড়াইল। এখন টঙ্গষ্টেনের পূর্ণ আধিপত্য।

কিন্তু এইরূপে তারের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালিত করিয়া তাহাকে অত্যধিক উত্তপ্ত করা এবং সেই উত্তপ্ত

তার হইতে আলোক-রশ্মি উদ্ভূত করা ব্যতীত অন্য উপায়ে তড়িৎ হইতে আলো পাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। দুইটা কারবন্-মধ্যে খুব প্রচণ্ড একটি তড়িৎ-প্রবাহ চালিত করিয়া কারবন্ দুইটির মুখ যদি একটু ফাঁক করিয়া দেওয়া যায় তো তন্মধ্যে যে আলোক উদ্ভূত হয়, দীপ্তিতে তাহা সকল প্রকার আলোককে পরাভূত করে, এবং বায়ুশূন্য কাঁচগোলকের মধ্যে এই কারবন্ দুইটি রাখিলে উহাদের তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইবারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই আর্ক লাইট (Arc light) এখন বড় বড় ষ্টেশনে, কারখানায়, বাগানবাড়ীতে, প্রমোদভবনে ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কারবন্ পরিবর্ত্তে পারা ব্যবহৃত হইতেছে।

এইরূপ নানা কৃত্রিম আলো দ্বারা অর্দ্ধ শতাব্দীমধ্যে মানব রাতকে দিন করিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিল; কিন্তু তবুও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে,এ আলো বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের আলো নয়। একটা জুয়েল ল্যাম্প যখন জ্বলে,

তখন উদ্ভূত শক্তির এক পাই আন্দাজ আলোরূপে প্রকাশ পায়, বাকী সমস্তটা উত্তাপে অপচয় হইয়া যায়। জোনাকি যে আলো দেয়, তাহাতে উত্তাপ নাই, শুধু দীপ্তি আছে; মানব যে কৃত্রিম আলো প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতে আলোর সঙ্গে সঙ্গে আলোর ৮।৯ গুণ উত্তাপ উদ্ভূত হইতেছে; এ উত্তাপ সে চায় না; কিন্তু শক্তির এ অপব্যয় সে রোধ করিতে পারিতেছে না। সেই আলোই বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ আলো—যাহা কেবলমাত্র আলোই দিবে, তাপ দিবে না।

১২

প্রাণহীন হইতে প্রাণীর সৃষ্টি সম্ভব কি না, মধ্যে এ প্রশ্ন একবার জটিল হইয়া উঠে। একদিকে তো বরাবর দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ হইতে মানুষ, পশু হইতে পশু, গাছ হইতে গাছ জন্মায়; অপরদিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একটা পাত্রে জল রাখিয়া দিলে দু'একদিনের মধ্যে উহাতে নানা রকমের পোকা কিল্‌বিল্‌ করিতে থাকে; দুধ খানিকক্ষণ পরে পচিয়া উঠে এবং অণুবীক্ষণের তলে দেখা যায়, এই পচা দুধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত পোকা বেড়াইতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এ-স্থলে জল দুধের ন্যায় জড় পদার্থ হইতে জীবের সৃষ্টি হইল।

ইডেন (Eden) উদ্যানে যে এক জোড়া করিয়া মানুষ, গরু, গাধা, ছাগল, মাছি, মশা, উকুন, কেন্নো ছিল

এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান মানব, পশু, কীট, পতঙ্গ তাহাদের বংশধর, এ কথা এখন না মানিলেও চলে। বিশ্বস্রষ্টা হঠাৎ একদিন ইচ্ছা করিলেন, জগতে প্রাণী হউক, অমনি মীন, কূর্ম্ম জলে, কৃমিকীট স্থলে, ভেকগুলা খালে দেখা দিল; অমনি সিংহ শৃগালের পিছু দৌড়িল, সাপ ব্যাঙকে তাড়া করিল, বিড়াল ইঁদুর ধরিতে গেল আর মানুষ আলুভাতে ভাত চড়াইয়া দিল, এইরূপ জগৎ-কল্পনায় ঈশ্বর যিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, যিনি পূর্ণকাম, তাঁহাতে বৈষম্যাদি কলঙ্ক আরোপ করিতে হয় কি না, দর্শনশাস্ত্র সে কথার মীমাংসা করুক। অভিব্যক্তিবাদ মানিয়া লইয়া বিজ্ঞান স্বীকার করিয়াছে, জীবদেহের গঠন সহজ ও সরল হইতে ক্রমশঃ জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং জগতে এই বৈষম্যময় জীবনের আদিতে যে এক সহজ সরল জীবন-প্রবাহ ছিল, এ কথা ধরিয়া লইলে এই দাঁড়ায় যে, বিজ্ঞান যদি তাহার পরীক্ষাগারে জীবদেহের প্রথম বিকাশ জীবকোষ তৈয়ারি করিতে পারে তো বিজ্ঞান মানুষেরও স্রষ্টা।

এখন কথা হইতেছে, বিজ্ঞান ইহা পারে কি না?

পচার কারণ যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং পচা দ্রব্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর সন্ধান যিনি পাইয়াছিলেন, সেই পাস্তুরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। এই বাতাসে ইন্দ্রিয়ের অতীত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করিতেছে; পাস্তুর দেখিলেন যে, যে জীবাণু দ্বারা জিনিষ পচে, সেই জীবাণু এই বাতাস হইতেই আসে। একটি পাত্রে কোন পচনশীল দ্রব্য রাখিয়া পাত্রের মুখটি যদি পেঁজা তুলা দিয়া বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রমধ্যে বাতাসের গতি অপ্রতিহত থাকিলেও পাত্রমধ্যস্থ পদার্থ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। ইহার কারণ, এই বাতাসের মধ্যস্থিত জীবাণু তুলার মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া গেল, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষায় কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যে সরিষা দিয়া ভূত তাড়ান হইবে, দেখিতে হইবে, ভূত সেই সরিষার মধ্যে না থাকিয়া যায়; ঐ তুলা বা ঐ

পাত্রমধ্যে জীবাণু পূর্ব্ব হইতে না রহিয়া যায়। প্রথম পরীক্ষায় একটি পরিষ্কার কাচের পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া পাত্রের মুখটি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কয়েকদিন পরে দেখা গেল, ঐ জলে পোকা বেড়াইতেছে। এইবার এ পাত্র এবং জলকে বেশ করিয়া ফোটাইয়া যাহাতে জলমধ্যস্থ জীবাণু মরিয়া যায়, এইরূপ করিয়া পূর্ব্ববৎ রাখা হইল, এবারেও পোকা দেখা দিল। আসল ব্যাপারটা এই—কতকগুলি জীবাণুর চারিধারে একটা শক্ত আবরণ পড়িয়া যায়; আঁবগাছের কচি চারা সহজেই মরিয়া যায়; কিন্তু আঁবের আঁটি অনেক দিন টিকিয়া যায়, বাহিরের একটা শক্ত আবরণ ভিতরের শাঁসটাকে রক্ষা করে। বাহিরের আবরণের মধ্যস্থিত জীবাণুকে মারিয়া ফেলিতে অনেক বেগ পাইতে হয়, একবার ফুটাইয়া লইলেও ইহারা বাঁচিয়া থাকে এবং পরে কীটরূপে দেখা দেয়। বার বার ফুটাইলে ইহারা মরে। এইরূপ বহুবার ফোটান জল বহুবার

ফোটান পাত্রে রাখা হইল, আর পোকা দেখা দিল না।

জড় হইতে জীবের উৎপত্তি মানব আজও কোথাও দেখিতে পায় নাই। এ পৃথিবীতে তবে প্রাণের সৃষ্টি কবে ও কিরূপে হইল? কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করিতেন, কোন এক দূর অতীতে সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী অপর এক গ্রহের সহিত ধাক্কা খায়। তখন সেই গ্রহের কতকটা অংশ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধরার জীবিত পদার্থ আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পরে যে আর একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—ঐ দ্বিতীয় গ্রহে প্রাণী কোথা হইতে আসিল? পৃথিবী হাতীর উপর আছে বলিলে একটা শক্ত সমস্যার খুব এক সহজ সমাধান হয় বটে; হাতীও না হয় কচ্ছপের উপর রহিল, কিন্তু তাহার পর? সমস্ত বিশ্বের নিকট তো সেই পূর্ব্ব প্রশ্ন রহিয়া গেল? বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, প্রাণহীন হইতে

প্রাণীর উৎপত্তি এ যুগে অসম্ভব হইলেও পৃথিবীর এমন এক দিন ছিল—যখন বাহিরের অনুকূল অবস্থায় ইহা সম্ভব হইত। তাঁহারা বলেন, একটি জীবকোষের গঠন এতই জটিল যে, উহা জীবনের প্রথম বিকাশ বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে জীবনের এই প্রথম অভ্যুদয় অতিশয় সরল ছিল, কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়াছে; তখন জড় হইতে জীবের সৃষ্টি সম্ভব হইত। সাধারণে বলে যে, পাছে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাই বিজ্ঞান নানা দিক্ দিয়া নানা তথ্য খাড়া করিতেছে। এই বিশ্বে পদার্থের ও শক্তির হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, শুধু রূপান্তর আছে মাত্র। বৈজ্ঞানিক বলে, যখন সে এতটুকু শক্তি বা পদার্থের একটি কণাও সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ বলহীন, তখন তামার উপর এসিড্ দিয়া তুঁতে তৈয়ারি করিতে তাহার যে বাহাদুরী, প্রাণী সৃষ্টি করায় তাহার কৃতিত্ব তদপেক্ষা খুব বেশী নয় এবং তাহাতে এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার অসীমত্ব কণামাত্র হ্রাস হয় না।

১৩

ভাদ্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন যে পাঁচ টাকায় ইলিসের জোড়া বিকাইয়াছিল, সেটা সমস্ত বর্ষার দৈনিক দর থাকিত—যদি ইলিস মাছের জন্য কলিকাতার কাছাকাছি গঙ্গা কলিকাতাবাসীর একমাত্র ভরসা হইত। কিন্তু এখন পদ্মার ইলিসও কলিকাতায় আসিতেছে এবং অনেক সময় পচার কোন চিহ্ন তাহাতে পাওয়া যাইতেছে না। এ তো শুধু কয়েক ঘণ্টার কথা, কিন্তু এই পচা নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় লণ্ডনবাসী অষ্ট্রেলিয়ার কাঁচামাংস, কালিফোরনিয়ার ফল-মূল এবং সাইবেরিয়ার পনীর-মাখন দোরের গোড়ায় বসিয়া অবিকৃত অবস্থায় পাইতেছে।

জিনিষকে পচার হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা

মানবের আদিম যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। বন্য শীকারী মাংস রোদে শুকাইয়া নুন দিয়া রাখিত, গৃহিণী চৈত্রের কাঁচা আমে নুন, লঙ্কা, হলুদ, তেল দিয়া কাসুন্দি বা আচার করিয়া রাখিয়া দেয়। কিন্তু শুঁটকী মাছে তো মাছের স্বাদ মিলে না, আঁবের আচারকেও আঁব বলিয়া চালান যায় না। পাস্তুর যখন দেখাইলেন যে, জীবাণু দ্বারা এই পচনক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তখন প্রথম প্রথম দিনকতক জীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা পচনশীল দ্রব্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। নুন-হলুদ যে এই সকল জীবাণু-নাশে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ, পাস্তুরের আবিষ্কৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে সাংসারিক অভিজ্ঞতার ফলে মানব এ কথা জানিয়াছিল। কিন্তু নুন-হলুদ তো সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারী নয়—আর সব জিনিষেও দেওয়া চলে না; তাই প্রথম প্রথম বোরিক এসিড্ (Boric acid), স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic acid), ফরম্যাল্ডি হাইড্

(Formaldehyde) প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল, এই সকল দ্রব্য মানব-শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নয়। তখন বৈজ্ঞানিক অন্য উপায় অবলম্বন করিল। যে জীবাণু দ্বারা পচনক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই জীবাণু মারিয়া ফেলিয়া নূতন জীবাণুর আগমন প্রতিরোধ করিতে পারিলে পচনক্রিয়া বন্ধ হয়। একটা টিনের কৌটায় মাংস বা দুধ বেশ করিয়া ফুটাইয়া, সেই উত্তপ্ত অবস্থায় কৌটার মুখটা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে সেই দুধ বা মাংসের আর পচিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশে এই উপায়েই টিনের কৌটায় আম লিচু সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই উপায়ে সকল দ্রব্যের আস্বাদ অবিকৃত রাখা যায় না; তাই এখন অনেক স্থলে অন্য আর এক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা কোন পদার্থের মধ্যে কোন পচনশীল দ্রব্য রাখিয়া দিলে উহার অন্তরস্থ জীবাণুগুলি একেবারে জমিয়া অসাড় হইয়া যায়—যদিও একেবারে মরে না, তাহাদের কার্য্যকরী

শক্তি একেবারে লুপ্ত হয়; এই অবস্থায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইলেও পচনক্রিয়া আরম্ভ হয় না। ঠাণ্ডা করিবার খুব সহজ উপায় হইল বরফ; লবণ-মিশ্রিত হইলে তো আরও ভাল। সুতরাং প্রচুর বরফমধ্যে কোন পচনশীল দ্রব্যকে অবিকৃত অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া রাখিতে পারা যায় এবং এইরূপ করিয়া রাখিলে ঐ সকল দ্রব্যের আস্বাদ অনেক পরিমাণে বজায় থাকে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে এই উপায়কে কার্য্যকরী করিতে হইলে সস্তায় প্রচুর বরফ উৎপাদন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অধুনা তাহার অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি উপায়ের মোটামুটি ব্যাপার এই।—কোন স্থান হইতে বাতাস যেরূপ বাহির করিয়া লওয়া যায়, তেমনি উহার মধ্যে বেশী পরিমাণে বাতাস চাপিয়া রাখা যায়, ফুটবলের ব্ল্যাডারের মধ্যে যেমন রাখে। অত্যধিক চাপযুক্ত বাতাস বা অন্য কোন গ্যাস যদি হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া

যায় তো হঠাৎ কলেবরবৃদ্ধিজনিত অত্যন্ত বেশী ঠাণ্ডা উদ্ভূত হয় এবং সেই ঠাণ্ডার তীব্রতা এত অধিক হইতে পারে যে, ঐ গ্যাস বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এখন জলীয় অবস্থাপ্রাপ্ত এই গ্যাসকে যদি একটি নলের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া লওয়া যায় এবং সেই নলের চতুর্দ্দিকে যদি জল থাকে, তাহা হইলে এই জল হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্যাস আবার জলীয় হইতে বাষ্পীয় আকার ধারণ করিবে এবং জলের এই উত্তাপত্যাগের ফলে উহা জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার আছে; তবে মূল তত্ত্ব হইল এই। কোথাও বাতাস, কোথাও এমোনিয়া গ্যাস (Ammonia Gas), কোথাও বা কারবন্ ডায়ক্-সাইড্ (Carbon Dioxide) গ্যাস ব্যবহৃত হয়। জলীয় হইতে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হইবার পর ঐ গ্যাসকে আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরাইয়া আনা হয় এবং এইরূপে উহা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে থাকে। গ্যাসকে

অত্যধিক পরিমাণে চাপিবার জন্য এক দিকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিন্ (Engine) চলে; সুতরাং বড় বড় বরফের কলে এক কৌতুককর ব্যাপার দেখা যায়। এক দিকে রাশি রাশি কয়লা হু হু করিয়া জ্বলিতেছে এবং অপর দিক্ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই বাহির হইয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি কোন কোন স্থানে অন্য আর এক প্রক্রিয়া দ্বারা বরফ প্রস্তুত হইতেছে। কোন জলীয় দ্রব্য যদি চট্ করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, এই পরিবর্ত্তনের ফলে ঐ পদার্থের চারিদিকের স্থানটা বেশ ঠাণ্ডা হয়; স্পিরিট্ বা কোন এসেন্স শরীরের উপর উপিয়া যাইলে ঐ কারণে শৈত্যবোধ হয়। এই উপায়ে টাকাটাক এসেন্স খরচ করিয়া পরীক্ষাগারে সিকি কাঁচ্চাখানেক বরফ তৈয়ারি করিয়া ফেলিতে পারা যায়। কিন্তু এমন কোন উপায় যদি উদ্ভাবন করা যায়—যাহাতে বাষ্পাকারে পরিণত ঐ এসেন্সকে

একটুও পলাইয়া যাইতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাষ্পীয় অবস্থা হইতে উহাকে পুনরায় জলীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ঐ একই পরিমাণ পদার্থকে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা চলে; সুতরাং এই উপায়ে ঐ এসেন্স-জাতীয় একশিশি দ্রব্য হইতে অফুরন্ত বরফ তৈয়ারি করিয়া ফেলা যায়, শুধু উহাকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণত করিতে যা পরিশ্রম ও খরচ। মনে করা যাউক, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ দুইটি পাত্র—একটি সরু লম্বা নল দ্বারা সংযুক্ত; প্রথমটিতে এমোনিয়া গ্যাস-মিশ্রিত জল আছে; দ্বিতীয়টি একেবারে খালি। প্রথমটিতে উত্তাপ দিলে এমোনিয়া আস্তে আস্তে জল হইতে বাহির হইয়া দ্বিতীয় পাত্রটিতে জমা হইবে; ঐ দ্বিতীয় পাত্রটি কিন্তু জল দ্বারা বেষ্টিত থাকায় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, সুতরাং উহাতে ঐ এমোনিয়া গ্যাস প্রবেশ করিয়া জলীয় আকার ধারণ করিবে। এইবার যদি প্রথম পাত্রটির সন্নিকট হইতে উত্তাপ সরাইয়া লইয়া উহাকে

অল্প একটু ঠাণ্ডা করা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পাত্রের তরল এমোনিয়া হু হু করিয়া উপিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে ঐ পাত্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ জল একেবারে জমিয়া যাইবে। এমোনিয়া আবার প্রথম পাত্রে আসিয়া জমা হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। এইরূপে খানিকটা এমোনিয়া লইয়া কাজ বরাবর চালান যাইতে পারে। আমেরিকার কতিপয় সহরে এই প্রণালীতে প্রতি বাড়ীতে বরফ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তথায় যাহারা বরফ করে, তাহাদের বাড়ীতে জল, ড্রেণ, গ্যাস ব্যতীত আরও দুইটি করিয়া নল গিয়াছে। একটি দিয়া জলীয় এমোনিয়া সরবরাহ হয়; এই জলীয় এমোনিয়া দ্বিতীয় নলটির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে উহা সহরের কেন্দ্রস্থিত সম্পূর্ণ আবদ্ধ এক ঠাণ্ডা ঘরের সহিত যোগ হয়; ফলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে উহা বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং তজ্জনিত ঠাণ্ডায় পরিপার্শ্বস্থ খানিকটা জল জমিয়া বরফ হয়।

পচন-নিবারণের জন্য মানুষের চেষ্টা এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই; তথাপি আজিকার দিনেও বৎসরে প্রায় ৫০ কোটী টাকার মাংস এবং সেই মূল্যের অন্যান্য টাট্‌কা সামগ্রী বরফের মধ্যে সংরক্ষিত হইতেছে।

১৪

এই নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈথর বলিয়া বৈজ্ঞানিকের কল্পিত একটি পদার্থ আছে। এই ঈথর সমস্ত বিশ্বের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-মধ্যে সংযোগ-সাধন করিয়া সকলকে এক কোলে স্থান দিতেছে; এই ঈথরকে চাক্ষুষ দেখান যায় না; তবে নানান্ উপায়ে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বাতাসের তরঙ্গ দ্বারা যেমন আমাদের শ্রুতির অনুভূতি হয়, এই ঈথর-তরঙ্গ তেমনি আমাদের দৃষ্টির উৎপাদক। ঈথরের ঢেউমাত্রই আমাদের চক্ষুর গোচর হয় না, কম্পন-সংখ্যা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিলেই তবেই উহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়। মনে করা যাউক, আমরা একটি

অন্ধকার ঘরে আছি এবং কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন যন্ত্র-বিশেষ দ্বারা ইচ্ছামত ঈথর-তরঙ্গ উৎপাদন করাইতেছে। কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে এক, দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটী, লক্ষ কোটী, কোটী কোটী—আমরা কিছুই দেখিতেছি না; কম্পন-সংখ্যা যখন প্রতি সেকেণ্ডে চারি কোটী কোটী বারে পৌছিল, তখন হঠাৎ সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক দেখা দিল। সংখ্যা আরও বাড়ান হইতে লাগিল, আলোর রং লাল হইতে পীত, পীত হইতে সবুজ, সবুজ হইতে নীল, যখন সেকেণ্ডে ৮ কোটী কোটী বার কাঁপিতে লাগিল, তখন রংটা বেগুনে বলিয়া মনে হইল; সংখ্যা আরও বাড়ান গেল, আমাদের চক্ষু পরাস্ত হইল—যে অন্ধকার, আবার সেই অন্ধকার।

আলোর এ তত্ত্ব বিজ্ঞান অনেক দিন হইতে জানে এবং ৪ কোটী কোটী বারের ঠিক এদিকের কতকগুলি কম্পন যে উত্তাপরূপে আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচর

হয়, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি মানব তাহারও নীচের ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে এবং তাহারই সাহায্যে এই ধরাপৃষ্ঠে জলস্থলের দূরত্ব মোচন করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে তাহার প্রতিবাসী করিয়া তুলিতেছে।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (Clerk Maxwell) তড়িৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে দেখিলেন যে, যে ঈথরের তরঙ্গ দ্বারা আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি হয়, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সেই ঈথরের মধ্য দিয়াই পরিচালিত হইতে পারে। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা নয়—বিজ্ঞানকে গণিতের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া ম্যাক্সওয়েল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে জার্ম্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হার্টজ এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে করিতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করিবার এবং উহাদিগকে ধরিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন।

তারহীন বার্ত্তাবহের সূচনা এইখানে হইল। কিন্তু ইহা সূচনা মাত্র; কারণ, এই যন্ত্রে তরঙ্গগুলি ধরিবার অংশ সন্তোষজনকরূপে কাজ করিত না। তাহা ছাড়া তরঙ্গ উৎপাদনে তড়িৎশক্তির অপচয় এত বেশী ঘটিত যে, খুব নিকট হইতে না হইলে উহাদিগকে ধরা অসম্ভব হইত। আলোকের ধর্ম্ম যে এই সকল তরঙ্গে বিদ্যমান, হার্ট্‌জ লক্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু ঐ সকল তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশী হওয়ায় তাঁহার ঐ যন্ত্র দিয়া সূক্ষ্ম ও সুচারুরূপে প্রমাণ করা সম্ভবপর হইল না। ইহার কিছু দিন পরে অল্প-বয়সেই হার্ট্‌জ মারা গেলেন। ইহার পর ভারতবর্ষের জগদীশচন্দ্র বসু ঐ কার্য্যে হাত দিলেন, এবং যদিও পরে ফ্রান্সের ব্রান্‌লী (Branley), ইটালির রিঘি (Righi) ও ইংলণ্ডের লজ্‌ (Lodge) এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে নির্ম্মিত যন্ত্র সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল এবং এই জগৎ ব্যাপিয়া যে তারহীন বার্ত্তাবহের প্রতিষ্ঠা হইল,

জাগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিশেষভাবে তাহার সহায়তা করিল; তাঁহার গ্যালিনা (Galena) কোহিয়ারার (Coherer) পরিবর্ত্তিত আকারে ক্রিষ্টাল ডিটেক্টর (Crystal detecter) রূপে আজ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হই-তেছে। [আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তারহীন বার্ত্তাবহের পেটেণ্টগ্রহণকারী Muirhead company জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন—Just a line to say how pleased we were to have the opportunity of discussing with you the bearing of some of the results of your recent researches upon certain practical points in the manufacture of wireless telegraphic apparatus. We have already benefited by your work in the construction of the most important part of such apparatus] প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন যন্ত্রনির্ম্মাণাগার বলিয়া কিছুই ছিল না, সুতরাং জগদীশচন্দ্রকে নিজহস্তে এ যন্ত্র

নির্ম্মাণ করিতে হয়। [The originality of the achievement is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. He had to construct himself his instruments as he went along.······Times]. বিলাতের রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌ (Royal Institution), ফ্রান্সের প্রধান বিজ্ঞান-সভা, জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন (Lord Kelvin) তাঁহার যন্ত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞান-সভার সভাপতি অধ্যাপক কর্ণু (Cornu) বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে অন্যান্য গবেষণা করিবার জন্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্র গ্রহণ করিলেন। [Lord Kelvin declared himself literally filled with

wonder and admiration for so much success in these dificult and novel experimental problems—Times.] অধ্যাপক কর্ণু লিখিলেন, "For my own part I hope to take full advantage of the perfection to which you have brought your apparatus for the benefit of the Ecole Polytechnique and for the sake of the researches I wish to complete. The very first results of your researches testify to your power of furthering the progress of science. You should try to revive the grand tradition of your race which bore aloft the torch-light of science and art and was the leader of civilization two thousand years ago. We in France applaud you and wish you every success.] আলোকের প্রত্যেক খুঁটিনাটি গুণ যে এই

সকল ঈথর-তরঙ্গে বর্ত্তমান, জগদীশচন্দ্র নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রমাণিত করিলেন। ১৮৯৫ সালে কলিকাতার টাউনহলের একদিকে তিনি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার যন্ত্রদ্বারা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করিলেন; বিনা তারে অপর দিকে উহা পরিচালিত হইয়া একটা পিস্তল আওয়াজ করিল।

এই সময় ইটালীবাসী ২০।২২ বৎসরের একটি যুবক মার্কনি (Marconi)—বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা দূরে বার্ত্তা-প্রেরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইটালীতে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া লণ্ডনে আসিয়া তিনি দুই মাইল ব্যবধানে বিনা তারে সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হইলেন। ইহার পর তরঙ্গ পাঠাইবার এবং উহাদিগকে ধরিবার আরও অনেক উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯০৭ সালে বাতাস বা মাটীর মধ্য দিয়া তরঙ্গ-প্রেরণের সম্ভব হওয়ায় আয়র্ল্যাণ্ড (Ireland) ও ক্যানেডা (Canada)র মধ্যে তারহীন বার্ত্তাবহ স্থাপিত হইল। এখন পৃথিবীময়

উহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; প্রতি বড় জাহাজে এক একটি যন্ত্র স্থাপিত হইতেছে; মার্কনি কোম্পানী ব্যতীত আরও কত কোম্পানী বাজারে দেখা দিয়াছে ; প্রত্যেক কোম্পানী আপন আপন যন্ত্রের উন্নতি একচেটিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হইতেছে না বলিয়া ব্যাপার মাঝে মাঝে আদালত অবধি গড়াইতেছে ।

এখানে একটা কথার মীমাংসা হইয়া যাওয়া ভাল —কে আগে এই বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন —মার্কনি না জগদীশচন্দ্র ? সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের তখনকার বিজ্ঞান-অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর নাম এ দেশের অনেকের নিকট সুপরিচিত ; ১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্রকে তিনি লিখিতেছেন—

Calcutta 1-8-97
10 Park Street.

My dear Jagadish,

I would like to give a public lecture at St. Xavier College Hall on "Telegraphy without wires," but as the instruments you so kindly gave me are not in working order and as I would like to take this opportunity to vindicate your rights to priority over Marconi, would you assist me in my Lecture with your presence and work your own instruments. Let me know as soon as possible as I intend inviting the Lieutenant Governor.…

Very sincerely yours
(Sd) E. Lafont S. J.

বঙ্গের ছোটলাটের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ সভায় সাধারণের সমক্ষে ফাদার লাফোঁ প্রমাণ করিলেন যে, মার্কনির পূর্ব্বে ভারতবাসী জগদীশচন্দ্র বিনা তারে সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

একটা ঘরে যদি দুইখানা বেহালা থাকে এবং বেহালা দুইটি যদি অবিকল একই সুরে বাঁধা থাকে তো প্রথম বেহালাটিতে ঐ সুর বাজাইলে দ্বিতীয় বেহালাটির তার কাঁপিতে থাকে। প্রথম বেহালাটি কাঁপিবার সময় বাতাসে যে ঢেউ তুলে, সেই ঢেউ যদি এমন কোন জিনি-ষের উপর গিয়া পড়ে—যাহার কাঁপিবার তাল বাতাসের এই ঢেউএর তালের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বাতাসের ঢেউ উহার গায়ে পড়িলে ঢেউএর তালে তালে উহা নাচিতে থাকিবে, কিন্তু তালের একটু গর-মিল হইলে উহা একেবারে নিশ্চল নিথর হইয়া থাকিবে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণেও 'খোলে বোলে' মিল থাকা চাই; পাঠাইবার দিক্ হইতে যে তালে তরঙ্গ উদ্ভূত

হইতেছে, ধরিবার দিক্‌টাও সেই তালে বাঁধা থাকা চাই ; নচেৎ উহা কোন সঙ্কেতই গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই নিজেদের যন্ত্রের বিশেষত্ব শত্রুপক্ষের নিকট গোপন রাখিয়াও যুদ্ধের সময় তারহীন বার্ত্তাবহে গোপনীয় সংবাদের আদান-প্রদান চলিতেছে।

যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—মানুষ তাহার কাজে লাগাইতে পারিয়াছে, তাহার খুঁটিনাটি সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত রাখিলে একটি একচেটিয়া ব্যবসায় খুব লাভবান্ হওয়া যায় ; এই নীতির অবলম্বনে আজ জার্ম্মাণী সমৃদ্ধিশালী এবং অনেক ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন। কিন্তু এই পৃথিবীতে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি মনে করেন যে, জ্ঞানের দ্বার কোন সময় কোন অবস্থায় কাহার নিকট রুদ্ধ থাকিবে না—জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। [It is also worth remark that no secret was at any time made as to its construction so that it has been open to all the

world to adopt it for practical and money-making purposes—Electrical Engineer] ইচ্ছা করিলে এই যন্ত্র হইতে তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিতেন এবং আজ যে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেশের বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অর্পণ করিতেছেন, সেই সম্পত্তি বহুগুণ আকারে তাঁহার দেশকে লাভবান্ করিত; হয় ত তাহা করিত, কিন্তু এইরূপে লব্ধ অর্থে তাঁহার দেশ গৌরব বোধ করিবে, এ কথা জগদীশচন্দ্র কখন মনে করিতে পারেন নাই।

১৫

জ্ঞান সার্ব্বজনীন, ইহার কোন প্রাদেশিকতা নাই; এ কথা সত্য হইলেও বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা দিয়াছে, তাহার একটি বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে উহা বহুর মধ্যে একের সন্ধানে ফিরিতেছে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ব্রজেন্দ্রনাথের দর্শনে ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাহিরের শক্তি শুধু জড়ের উপর কিরূপ কার্য্য করে দেখিয়া ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক থামিলেন না, জীবের উপরও উহার ক্রিয়া লক্ষ্য করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যে ঐক্য, যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাতে মানবের চিরদিন-পোষিত জীবনের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

জীবদেহের অনেক বৈচিত্র্য অনেক খামখেয়ালি পদার্থবিজ্ঞান বা রাসায়নিক বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম দ্বারা মীমাংসিত হয় না দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ জীবনী-শক্তি বলিয়া প্রাণীর অভ্যন্তরস্থ একটি বিশেষ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতেন; জীবদেহের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা কিছু অবোধগম্য, তাঁহাদের এই কল্পিত জীবনীশক্তি দ্বারা মিল করিবার চেষ্টা করিতেন। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন, এ মিল শুধু গোঁজামিল মাত্র, জীবের সকল কার্য্য-কলাপের সদুত্তর ইহা দিয়া মিলে না, তাহা ছাড়া আসল ভিতরকার কথা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়। এই বিশ্বে শক্তির মধ্যে যে এত বড় একটা বিষম তারতম্য আছে, যে শক্তি ভীষণ ঝঞ্ঝারূপে মহীরুহ, অট্টালিকা প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া বিজয়ী সেনানীর মত নিজের প্রচণ্ডতা হতশ্রী পল্লীতে রাখিয়া যায়, তাহা একটা অন্ধ-শক্তি, আর যাহার বলে অন্ধকার ঘরে প্রোথিত লতার একটি ডগা উন্মুক্ত বাতায়নের আলো ও হাওয়ার দিকে

প্রসারিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে একটি জাগ্রত শক্তি বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে শক্তির এই বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হিন্দু বৈজ্ঞানিকের মন সাড়া দিল না। নানান্ দিক্ হইতে নানান্ পরীক্ষা দ্বারা তিনি দেখিলেন, পদার্থ-বিজ্ঞান অনুমোদিত জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়া জীবের মধ্যেও কাজ করে; এমন কোন রেখা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না—যেখানে বলা যায়, এই পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম শেষ এবং ইহার পর জীব-বিজ্ঞানের ধর্ম্ম আরম্ভ হইল। যে জাতিভেদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে এতদিন বিযুক্ত রাখিয়াছিল, জাতিভেদপ্রধান ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক সেই ভেদ মোচন করিয়া সকল বিজ্ঞানকে এক করিয়া দিলেন।

আসামে যখন যায়, তখন কুলী খুব সজোরে বুক ঠুকিয়া জানায়, সে কোথায় যাইতেছে; কিন্তু তাহার উত্তরের এই রুদ্ররসটা মর্ম্মান্তিক করুণরসে পরিণত হয় —যখন চা-বাগানের অভিজ্ঞতা ও আসামের কালাজ্বর

লইয়া সে ফিরে। আভ্যন্তরিক অবস্থা বাহিরের সাড়া দ্বারা ধরা পড়ে—তাই জীব বাহিরের উত্তেজনায় কিরূপ সাড়া দেয় দেখিয়া ভিতরকার খবর জানিতে পারা যায়। কিন্তু এখানে একটু গোল আছে। কোন জন্তুকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া সাড়া দেয়; জন্তুটি যদি বাক্‌শক্তিহীন হয় তো শুধু হাত-পা ছুড়ে; কিন্তু এই বোবা জন্তুকে যদি হাত-পা বাঁধিয়া মারা যায় তো সে কোন সাড়া দিতে সক্ষম হয় না; কিন্তু তাহার বেদনার অনুভূতি তো সমভাবেই প্রবল থাকে। লজ্জাবতী ছুঁইলেই উহার ডাল পড়িয়া যায়; কিন্তু আম, জাম, কাঁটাল গাছের হাত-পা বাঁধা, তাই উহারা প্রত্যক্ষ সাড়া দিতে পারে না। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে, এই বন্ধন খুলিয়া দিলে গাছ মাত্রই লজ্জাবতীর ন্যায় লজ্জাশীল। যে সব যন্ত্রের নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য দেখিয়া পাশ্চাত্য দেশের সুদক্ষ কারিকরগণ চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে, নিজের তত্ত্বাবধানে

নির্ম্মিত সেই সকল সূক্ষ্ম যন্ত্র যারা বহু সাড়া লিপি গ্রহণ করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, বাহিরের আঘাত জন্তুর স্নায়ু —পেশীর উপর যেরূপ কাজ করে, অবিকল সেই ভাবে উদ্ভিদকে উত্তেজিত করে। আঘাতের পর আঘাতে উদ্ভিদ কিরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্লোরোফরমে কিরূপ নির্জীব হয়, আবার বরফজল দিলে, বাতাস করিলে, কিরূপ পূর্ব্বের সজীবতা ফিরিয়া আসে, ক্লোরোফরমের মাত্রাধিক্যে কিরূপ চিরদিনের জন্য অসাড়তা আসে ইত্যাদি সম্বন্ধে নানান্ সাড়াচিত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার এই গবেষণার ফল প্রকাশের নিমিত্ত তিনি বিলাতের বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ পত্রিকার অধ্যক্ষের নিকট আনয়ন করেন। পত্রিকাধ্যক্ষ প্রথমই ঐ সকল সাড়া-চিত্র দেখিয়া অতি বিনীতভাবে জগদীশচন্দ্রকে জানান যে, ঐ প্রকার সাড়া-চিত্র পূর্ব্বেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। জগদীশ-চন্দ্র প্রথমটা অবাক্ হইয়া গেলেন, পরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন যে, পত্রিকাধ্যক্ষ ওগুলিকে ব্যাঙের

পেশীর সাড়া বলিয়া মনে করিয়াছেন; যখন তিনি বলিলেন—পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে, সেগুলি জন্তুর নয়, উদ্ভিদের সাড়া-চিত্র, তখন বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন কোন বৈজ্ঞানিক সন্দেহ প্রকাশ করায়—যখন তিনি এমন সব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন—যাহাতে আঘাত প্রদান, সাড়া গ্রহণ প্রভৃতি কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে যন্ত্র-সাহায্যে আপনাআপনি হইতে লাগিল, তখন বৈজ্ঞানিক-গণ নিঃসংশয়ে তাঁহার মত গ্রহণ করিল। এই সব যন্ত্র দ্বারা অনেক খুঁটিনাটি বিষয়েও জন্তু ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা তিনি দেখাইলেন। আভ্যন্তরিক যে ক্রিয়ার ফলে জন্তু সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়া অবিকল সেই কারণেই হইয়া থাকে, ইহা প্রমাণিত হইল। এই আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার মূলে যে জীবনীশক্তি বলিয়া কোন অজ্ঞেয় শক্তি নাই; বাহিরের শক্তি ভিতরকার অণুর বিকৃতি ঘটাইয়া যে পরিবর্ত্তন ঘটায়, তাহাই যে সাড়ারূপে দেখা

দেয়, বহু পরীক্ষা তাহা প্রমাণিত করিল। উদ্ভিদের যে সকল খামখেয়ালির কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া পূর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকগণ—"কালি গো করুণাময়ি প্রণমি তব পায়, এ বড় কঠিন প্রশ্ন কিছু নাহি বুঝা যায়" বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এক সহজ নিয়ম দ্বারা তিনি সমস্ত মীমাংসা করিয়া দিলেন।

এই সাড়া ব্যতীত উদ্ভিদ সম্বন্ধে অন্যান্য অনুসন্ধান করিবার জন্য অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন; কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে দেখিবার জন্য যে যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল, তাহা গাছের বাড়্‌কে লক্ষগুণ করিয়া চোখের উপর ধরিল; উদ্ভিদের স্নায়ুপ্রণালী আবিষ্কৃত হইল; উত্তেজনা কিরূপ বেগে তন্মধ্যে চালিত হয়, দেখিবার যন্ত্র এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগ সময়ে সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নূতন নূতন পুস্তকে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার স্থান লাভ করিল; কার্ভেথ রীড্ (Carveth

Read) বলিলেন, মনোবিজ্ঞানের কতকগুলি জটিল রহস্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার দ্বারা মীমাংসিত হইল; আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কৃষিশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র-ব্যবহারে সচেষ্ট হইলেন; বিলাতের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান সভা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার চিকিৎসাশাস্ত্রের নব নব পথ উন্মুক্ত করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক সেই সত্যের সন্ধানে ছুটিলেন—যাহা কোন বিশেষ বিজ্ঞানের কোন বিশেষ অংশের নয়—সেই বিরাট্ সত্য যাহার উপর সমস্ত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

তাই জীব ছাড়িয়া জড়ের উপরও বাহিরের আঘাত উত্তেজনার ক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন। প্রত্যক্ষ সাড়া ব্যতীত অন্য উপায়ে সাড়া গ্রহণ করিবার এক প্রণালী আছে; আহত স্থান হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চারিদিকে সঞ্চালিত হয় এবং তাহারই বল দ্বারা সাড়ার মাত্রা

নিরূপিত হয়। জন্তু ও উদ্ভিদের এই বৈদ্যুতিক সাড়া-লিপির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিয়া তিনি একটি জড় পদার্থ লইলেন এবং বাহিরের আঘাতে ইহাকে উত্তেজিত করিলেন; চিম্‌টি কাটিলেন, মোচড় দিলেন, রাসয়ানিক দ্রব্য প্রয়োগ করিলেন, বিদ্যুৎ দ্বারা অভিভূত করিলেন, দেখিলেন, জড়ের এই সাড়া-লিপি এই জাতির জীবের সাড়ালিপির মধ্যে মিশাইয়া দিলে আর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জো নাই, তখন কে বলিবে, এটা ব্যাঙের সাড়া, এটা গাছের সাড়া, এটা একটুকরা টিনের সাড়া। তাই রয়াল সোসাইটী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমক্ষে জড় ও জীবের সাড়ার একতা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন—

"যখন জড় ও জীব নিজেদের প্রস্তুত লিপিসাক্ষ্যের এই একতা লইয়া আমার চোখের উপর আসিল, যখন দেখিলাম, আলোকে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, এই ভূমণ্ডলের অগণিত প্রাণী, এবং উপরে দীপ্তিমান্ কোটী সূর্য্যের

মধ্যে এক বিরাট্ সাম্য আছে, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরে যে সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই সত্যের কিয়দংশ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল।

"এই বৈচিত্র্যময় পরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডে যাহারা শুধু এককেই দেখে, সত্য কেবল তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।"

পরিশিষ্ট

ঐন্দ্রজালিক নাকি ভানুমতীর আঁবগাছ দেখায়। একটি মাটীর টবে একটি আঁবের আঁটী পোতা হয়, দেখিতে দেখিতে আঁটী হইতে গাছ হয়, চোখের উপর সেই গাছ বাড়িতে থাকে, ফুল দেখা দেয়, ফল হয়, সেই ফলও পাকিয়া যায়; দর্শক চোখের উপর সমস্তই দেখে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান ঐন্দ্রজালিকের গাছের মত বাড়িয়া উঠিল।

আজ মানব আকাশে, জলের অভ্যন্তরে ইচ্ছামত

সন্তরণ করিতেছে, ধরাপৃষ্ঠে অবাধে বিচরণ করিতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে; নিজের পাড়ার খবর সংগ্রহ করা তাহার দুঃসাধ্য ছিল, আজ সে প্রতি প্রাতে সমস্ত পৃথিবীর খবর লইতেছে।

এডিসন্ পৃথিবীর সকল স্থানের সজীব ঘটনা তাঁহার চোখের সম্মুখে ধরিলেন; রন্‌জেন্ তাঁহার তৃতীয় নেত্র খুলিয়া দিলেন; জে, জে, টম্‌সন এই বিশ্বের মূলে তাহাকে লইয়া গেলেন; জগদীশচন্দ্র এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর অন্তর্নিহিত বিরাট্ ঐক্যের সন্ধান দিলেন।

পাস্তুরের প্রদর্শিত পথে চলিয়া লিষ্টার শস্ত্র-চিকিৎসা নিরাপদ্ করিলেন, রস্ ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের উপায় নিরূপণ করিলেন, মেচনিকফ্ জরার কারণ আবিষ্কার করিলেন।

কেল্‌ভিন্ ভীষণ আটলাণ্টিক্ মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়া

বৈদ্যুতিক তার লইয়া গেলেন, নোবেল পাহাড়-পর্ব্বত ধূলিসাৎ করিবার উপায় করিলেন। ইন্‌জিনিয়ারগণ মাটী কাটিয়া নদীতে পরিণত করিল, আবার নদী ভরাইয়া সমতল ভূমি করিয়া ফেলিল। আজ মানব হাজার মাইল দূরে সহজ গলায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে, মৃতের কণ্ঠস্বর শুনিতেছে।

লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য-বৃদ্ধিরও উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে; চাষ-আবাদ না করিয়াও পরীক্ষাগারে সুমিষ্ট সুখাদ্য আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে। এত দিন ধরিত্রী ছিল শুধু মানবের আহরণ-ক্ষেত্র, আজ বাতাসও ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের পর আরও অনেক তত্ত্ব প্রচারিত হইল; মেণ্ডেলের নব নব সিদ্ধান্ত এক নূতন যুগ আনয়ন করিল। ইউজিনিক্‌স্ (Eugenics) বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিল। ভবিষ্যতের একটি সুস্থ সবল সজীব বংশধারা গঠনে বর্ত্তমান মানব যে

একেবারে ক্ষমতাহীন নয়—লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিল।

বিজ্ঞানবলেবলীয়ান্ হইয়া মানব এই পৃথিবীকে, সুন্দর রমণীয় করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল; এই কল্পিত নন্দনকাননে তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ব্যাধি-জরা-বিমুক্ত হইয়া বিনা পরিশ্রমে সৌন্দর্য্যের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, জয়ের ভিতর দিয়াই অনেক জাতির পতন হইয়াছে। মানবও যদি সফলতার মোহকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া বিলাসী, আরামপ্রিয়, পরিশ্রমকাতর ও নব নব উদ্ভাবনায় পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ে তো তাহারও পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়াও যদি মানব আত্মজয় করিতে পারে—বাহিরের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যেও যদি অন্তরের দীনতা আত্মত্যাগ বজায় রাখিয়া তাহার উপনিষদ্-বেদান্তের বাণী বিস্মৃত না হয়—তাহার বুদ্ধ, তাহার যীশু, তাহার মহম্মদের

প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়, তবে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু এই মনুষ্যজাতি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লুপ্ত হইবে না।

সমাপ্ত